হাসান আজিজুল হক

চাষাচিত্রের খুঁটিনাটি

'যেমন নির্মেদ গদ্য
তেমনই নিরুচ্ছ্বাস আর্তি—বইটির
বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এইভাবেই
একবার বলেছিলেন শিবনারায়ণ রায়। বাংলার
প্রকৃতিজীবন আর লোকজীবনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ছবি
দিয়ে তৈরি করা এই বইতে আছে কিছু দুঃখী মানুষজনের কথা।
লেখক খুঁজতে গিয়েছিলেন স্নিগ্ধ জনপদ, তার বদলে খুঁজে
পেলেন কঙ্কালের নিঃশব্দ হাসির মতো গ্রাম, কিংবা
জানতে পেলেন যে বেনামীতে আজও চালু আছে
ক্রীতদাস প্রথা! ব্যক্তিস্মৃতিতে ভরপুর এই
বই এক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ
গ্রাম-পরিক্রমা।

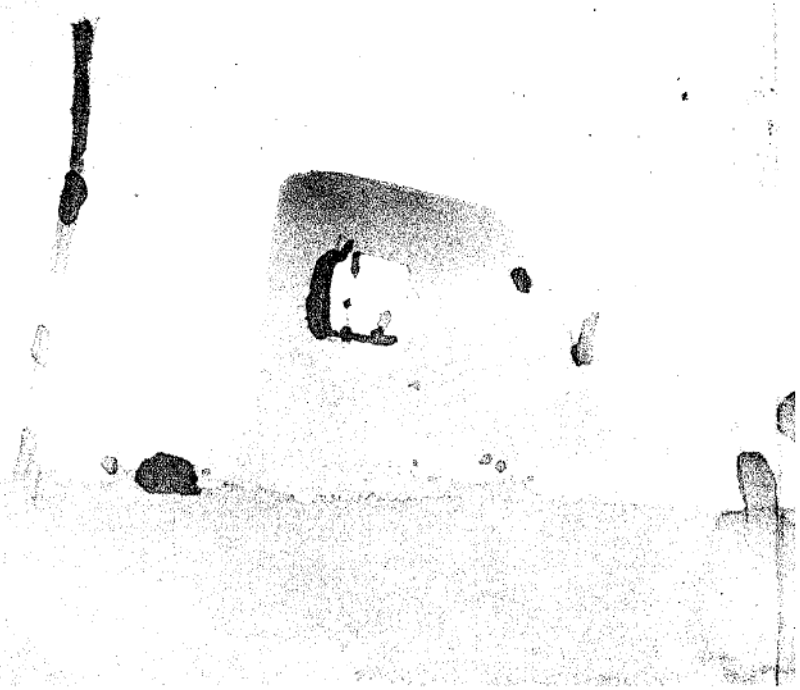

চালচিত্রের খুঁটিনাটি

হাসান আজিজুল হক

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

amarboi.com

দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই

আগুনপাখি

বর্তমান সংকলনের রচনাগুলি গল্প প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনি ব্যক্তিগত রচনা ইত্যাদি কোনো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত নয় অথচ এ সবেরই কিছু কিছু উপাদান লেখাগুলির মধ্যে মেশামেশি করে আছে। কবুল করছি, এই লেখাগুলির বেশ কয়েকটি গল্পের বিকল্প হিশেবে রচিত হয়েছিল, কিছুবা প্রবন্ধের বদলে, তবে প্রত্যেকটি রচনার মূল লক্ষ্য ছিল লোকজীবনের ছবি তুলে আনা, অসম্ভব না হলে সমাজের গতি-প্রকৃতির কিছুটা হদিশ দেওয়া। কাজেই সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদের কাজের ক্ষেত্রের উপর এই লেখাগুলি কখনো কখনো চড়াও হয়েছে। বিশেষজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানের যে অভাবটা দেখা গেছে, সেটা পূরণের চেষ্টা হয়েছে অল্পবিস্তর রসসিঞ্চনের দ্বারা।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বহুখ্যাত শিল্পী রফিকুন্নবী এই রচনাগুলির জন্যে মানানসই রেখা সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। মুক্তধারা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার কাছেও আমি অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি বইটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছেপে বের করার জন্যে। প্রকাশনার ব্যাপারে আমার অনেক খুঁটিনাটি দাবি ধৈর্যের সঙ্গে তিনি পূরণ করেছেন।

আরো একটি কথা। 'গল্পের জায়গা জমি মানুষ' নামের লেখাটি এর আগে আমার একটি সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। অসাবধানতার ফলেই এটা ঘটেছিল। লেখাটি ওই বইয়ে দলছুট, তার সঠিক জায়গা এই বইয়ে। পূর্বোক্ত গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে এই লেখাটিকে বাদ দেওয়া যাবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হা. আ. হ.

CHALCHITRER KHUNTINATI
Belles-lettres by HASAN AZIZUL HUQ
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 75.00

ISBN 978-81-295-0911-6

প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৯, মাঘ ১৪১৫
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬ (বাংলাদেশ)

প্রচ্ছদ/অলংকরণ : দেবব্রত ঘোষ

৭৫ টাকা

রাঢ়বঙ্গের সখা
সমরেশ নন্দী-কে

প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু
অকূল উদ্দেশে

arboi.com

চালচিত্রের খুঁটিনাটি

চরিত্রের সন্ধানে নয়, কাহিনির খোঁজেও নয়, খুব কাছ থেকে নজর করে মানুষ, তার জীবিকা আর যে জগতে সে আষ্টেপৃষ্ঠে আটক আছে তা দেখার জন্যে উত্তরাঞ্চলের একটি এলাকায় গিয়েছিলাম। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের আগেই দেখতে পাই, উত্তরাঞ্চলে বড়ো-বড়ো মাঠ আছে, সেই মাঠে বন-জঙ্গল লতাপাতার তেমন বাড় নেই। সহজেই বুঝতে পারা যায়, এখানকার মাটি পুরনো। একটা উঁচু মাঠে, লালচে কাঁকর ভর্তি মাটির উপর অনেকগুলো তালগাছ খুব কাছ থেকে দেখলাম। গাছগুলোর গুঁড়িতে প্রায় চোখ লাগিয়ে। মরচে ধরা মোটা মোটা লোহার তারের রঙের শিকড় দিয়ে গাছগুলো যেন ডালকুত্তার মতো মাটি কামড়ে ধরেছে। বেঁচে থাকার কী সাংঘাতিক পণ।

কোনো লেখায় খানিকটা প্রকৃতি বর্ণনা থাকলে এক সময় আমার মনে হত লেখকের মনে বেশ খানিকটা দয়ামায়া আছে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের এই এলাকায় প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে ওঠার উপক্রম। এক হাত দূরে ছোরা হাতে ভয়ানক আততায়ীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও যেন এমনভাবে আগাগোড়া শিউরে উঠতে হয় না। চারিদিক খোলা, বিবর্ণ, ধুলোটে। শুকনো মাটিতে এক ফোঁটা রস নেই, ঘাস পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে। এমন মনে হওয়ার একটা কারণ আমি বুঝতে পারি। প্রকৃতি একমাত্র সাহিত্যে ও কাব্যেই স্বতন্ত্র চেহারা ও অস্তিত্ব পায়, বাস্তব জীবনে নয়। জীবনে ব্যাপারটা দাঁড়ায় আলাদা। প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায় মানুষের জীবিকার উৎস, তার বাঁচার শর্ত ; তার জমি, তার ঘর-বাড়ি ; মেঘ-বৃষ্টি-রোদ, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ, শীতের দিনরাত্রি। মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি একেবারে অর্থহীন কাব্যি হয়ে পড়ে। বোধহয় এইভাবে ভেবে থাকব বলেই উত্তরাঞ্চলের প্রকৃতি আমার কাছে এত নিদারুণ মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই রোদে মানুষকে কোদাল চালাতে হবে, লাঙল বইতে হবে গৃহপালিত পশুর সঙ্গে, এই রোদ পোড়া আকাশের নীচে মাটির রস নিংড়ে খাদ্য খুঁটতে হবে, বর্ষায় ভিজতে হবে, উত্তরের হাড়-কাঁপানো বাতাস তাকে সইতে হবে। অস্তিত্বের সঙ্গে মেশা সেই

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের দীর্ঘদিন পরে 'চালচিত্রের খুঁটিনাটির'-র একটি দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কয়েকবছর আগে। এর একটি পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্করণ বের করতে কেউ যে কখনো আগ্রহী হবেন এমন চিন্তা আমার ছিল না।

লেখাগুলির সবই গত শতকের সত্তর-শেষ আর আশির দশকের রচনা। এদের গায়ে এখন কালানৌচিত্যের দাগ। তবে মানুষের বাস্তব সব জঞ্জাল টানতে টানতে, ফেলতে ফেলতে যখন ফেলে, সবই কি ফেলে? এগোয়। পুরনো মুখের জায়গায় নতুন মুখ দেখা দেয় কিন্তু মুখের মূল আদল তো বদলায় না! এই কথাটা আমার মনে আছে বলেই ভরসা পাই, 'চালচিত্রের...' লেখাগুলি পুরো বাতিল বোধহয় আজও হয়নি।

প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং-এর কর্তৃপক্ষ সেজন্য আগ্রহ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি সানন্দে সম্মতি দিয়ে দিলাম। সম্মতির পরে এবার কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত দু একটি লেখা এই নতুন সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে নানা কারণে অনেক পরে রচিত আর দু তিনটি লেখা এখানে যোগ করা হয়েছে ঝাঁকের সঙ্গে মানান-সই হবে বলে।

এই সংস্করণের জন্য নতুন করে প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র এঁকে দিয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী দেবব্রত ঘোষ। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

আর কিছু বলার নেই।

কলকাতা — হাসান আজিজুল হক
১২.১.২০০৯

সূচি

চালচিত্রের খুঁটিনাটি	১১
শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে	২১
খানের কথা	২৭
অপেক্ষা	৩২
দূরবাসী	৪০
যে ভিতরে আসে	৪৮
উত্তরের উপেক্ষিতা	৬৪
ভিতরের খানিকটা	৭২
গল্পের জায়গা জমি মানুষ	৮৫
আবার যদি ইচ্ছা করো	৯৪
নিজের দিকে ফিরে	১০৩
জোড়খোলা সেলাই-রেখায়	১০৯
দূরবীনের নিকট-দূর	১১৪

amarboi.com

অসহ্য সংগ্রামের কথা ভেবেই আমার মনে আতঙ্ক জন্মেছিল। আমরা ভদ্রলোকেরা, পরজীবী এবং পরশ্রম অপহারকরা যখন জনগণকে আরো পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে বলে মাগনা উপদেশ ঝাড়ি তখন সেই উপদেশ যে কী মর্মান্তিক উপহাস হিশেবে দেখা দেয়, উত্তরাঞ্চলের খরার খোলা মাঠে পাঁচ মিনিট স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকলেই তা হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। ভিতরের আরো খুঁটিনাটি জানার অপেক্ষায় থাকতে হয় না। আর সমাজগঠনের ভিতরের খুঁটিনাটি জানতে পারলে তো কথাই নেই। উপদেশ দেবার আগে নিজেকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে ইচ্ছে হবে।

মাঠে দাঁড়িয়ে দেখি উঁচু চওড়া সড়ক থেকে বাঁয়ে ডাইনে ধুলোভর্তি রাস্তা ভিতরের দিকে, দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে গ্রামে চলে গেছে। কিছুতেই গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথ নয়। গোড়ালি-ডোবা ধুলো, জায়গায় জায়গায় হাঁটুভর্তি, আপাতত বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না কারণ সামনেই বাঁক নিয়ে আবার রাস্তাটি চোখের আড়ালে চলে গেছে।

কথা ছিল। কাজেই আমাকে উঁচু সড়ক থেকে এইরকম রাস্তায় নেমে সাইকেলে চড়ে বসতে হলো। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে আসে। সাইকেলের চাকা ধুলোয় ডুবে যাচ্ছে– ধুলোর ভিতরে লুকিয়ে থাকা শক্ত শিরাওয়ালা মাটিতে পিছলে সাইকেল ছিটকে রাস্তার বাইরে চলে আসতে চাইছে, আরোহীর সাধ্য কি সিটে বসে থাকে? সঙ্গের গ্রাম্য যুবকটির মুখ দেখে একটুও বোঝার উপায় নেই যে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে। অবিকল এদেশের কৃষকের মুখ যেন। অকল্পনীয় বোঝায় যখন তার শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে, ঘাড়ের দুপাশের রগ যখন মচকে যায় যায়, তখনো কি সেই দুঃসহ কষ্টের কোনো ছায়া তার মুখে পড়ে? কৃষকের সেই নির্বিকার পাথরের মতোই মুখ আমার সঙ্গীটির। কোন্ লজ্জায় আমি তাকে বলি, কোনো এককালে সাইকেল চালাতে শিখেছি বলেই এই রাস্তায় সাইকেল চালানো আমার সাধ্য নয়? একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করি, ঘন বর্ষায় এই রাস্তার চেহারা কেমন দাঁড়াবে। রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া এক হাঁটু কালো কাদা থকথক করবে, মাইলের পর মাইল এই রাস্তা এগিয়ে গিয়ে অন্ধকার রাতে বা প্রচণ্ড বর্ষায় দিনে গ্রামে গিয়ে ঢুকবে। সেই সব অতিদূর গাঁয়ে মানুষরা থাকে– জন্মায়, বড় হয়, কাজ করে, অসুখে ভোগে, চোয়াল চেপে উপোস করে– তারপর একদিন মাটির তলায় গিয়ে সেঁধোয়। এতসব আমি কল্পনা করি– কিন্তু পুরো চিত্রটা কিছুতেই ধরতে পারি না। এই সময় সাইকেল থেকে

ছিটকে আমি কাঁটার জঙ্গলে আটকে যাই। আমার হাত থেকে সাইকেলের হ্যান্ডেল ফসকে যায়– সেটা কাত হয়ে পড়ে গেলে তার একটা প্যাডেল ঘরঘর শব্দে জোরে ঘুরতে থাকে। আমার সঙ্গীর মুহূর্ত দেরি হয় না, সাইকেল থেকে নেমে সে ছুটে আমাকে উদ্ধার করতে আসে। কটা রঙের বনকুল আর শেয়ালকুলের ঝোপ বাঁকা বাঁকা নখ দিয়ে বেড়ালের মতো আমার জামাকাপড় খামচে ধরেছে। মুখে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমি কিন্তু কাঁকুরে মাটিতে ডান হাতের তালু ছড়ে গিয়ে হাতটা থরথর করে কাঁপছে, আমি তা থামাতে পারি না।

বনকুল শেয়াকুলের ঝাড় আমার জামা-কাপড় থেকে তাদের ভাগ ছিঁড়ে নিল। কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে আমি সাইকেল হাতে নিয়ে দেখতে পাই, ধুলোভরা পথটি একটু সামনে গিয়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। পথের দু-পাশে একই রকম কাঁটাজঙ্গল, শুকনো মরা ঘাস। চোখ বন্ধ করে ভাবলেই বুঝতে পারি অঞ্চলটা একেবারেই খোলা– যেদিকে খুশি যাওয়া চলে। চোখ মেলে তাকাতে বুঝি পথ একটাই দু-পাশের মাঠ অনেক বেশি দুর্গম। যেতে হলে এই পথেই যেতে আমি বাধ্য। তখন আমার অসহ্য কষ্ট নিয়তি-নির্দিষ্ট মনে হয়। পালাবার উপায় নেই, এমনকী হাল ছেড়ে দেবারও রাস্তা নেই। আমার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড এইরকম উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ থমকে যায়।

যখন সাইকেলের প্যাডেল ঘোরানোর ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন একটু দূরে পথের পাশে একটা ভাঙা লাল মাটির দেয়াল দেখতে পেয়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দে আমার বুক ভরে ওঠে। এই ভাঙা দেয়াল ঘেঁসে বাঁক নিয়ে রাস্তাটি গাঁয়ে ঢুকেছে। বাঁকটি ঘুরে নিশ্চয়ই দেখতে পাব বিশাল বট বা অশথ গাছ– কালো ঠান্ডা ছায়া বিছিয়ে আছে। পাশে একটি শান-বাঁধানো ইঁদারা। আর একটু দূরে উঁচু পাড়ওয়ালা বড় দিঘি। হয়তো তার একটি ঘাট বাঁধানো। তা যদি হয়, তা হলে আরো বড়ো বড়ো বট অশথ আছে, স্তব্ধ দুপুর বেলায় কোকিলের চিৎকার ইত্যাদি। কোথায়? কাছে গিয়ে দেখি লাল দেয়ালটি একটি ঘরের চার দেয়ালের একটি। বাকি তিনটি দেয়াল অনেক আগে পড়ে গেছে, বৃষ্টিতে গলে গলে মাটির ঢিবি তৈরি হয়েছে। ওই একমাত্র ন্যাড়া বৃষ্টিধোয়া শূন্য দেয়ালটি আমাকে ভ্যাঙাল। ওটার পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে দেখি বট অশথ, দিঘি গ্রাম-বধূ গরু-ছাগল কিছুই নেই। আশেপাশে ইতস্তত মাটির দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ঘরেরই চাল বা ছাদ নেই। কোনো ঘরের চার দেয়াল একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, দুর্দান্ত কাঁটা ঝোপ

পুরো ভিটে ছেয়ে ফেলেছে। কী বিবর্ণ, কী বিচ্ছিরি, কী এলোমেলো মাটির উপর কুঁজের মতো এইসব ধসে যাওয়া ভিটে। সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, এখানে কোনো এককালে একটা ছোট গ্রাম ছিল, এখন উঠে গেছে। দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোষণ, অত্যাচার বা প্রকৃতির নির্মমতায়।

ট্রেনে চেপে এই এলাকার ভিতর দিয়ে গেলে মাটির ঘরের গ্রাম নজরে আসে। সবই অবশ্য পরিত্যক্ত নয়– লোকজন বসবাস করছে। ট্রেনের গতির জন্যে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে চোখের আড়ালে চলে যায়। বসে বসে দেখতে ভালোই লাগে– জয়নুল আবেদীন বা কামরুল হাসানের আঁকা ছবির মতো। সাদা জমির উপর গেরুয়া রঙের মাটি দিয়ে তৈরি। ওঁরা এঁকেছেন খুবই যথাযথ। খুবই যথাযথ, তবে ছবি দেখে এইসব গ্রামে জীবনযাত্রা যেমন মনে হয়, এখানকার মানুষজনের আসল জীবনযাত্রা মোটেই তেমন নয়। ট্রেনের জানালা দিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকলে সে ব্যাপারটা অবশ্য ধরতে পারার কথা নয়। ছবির বাংলাদেশ বা সাহিত্যের বাংলাদেশ ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবুজ ঘাস, লাল ধুলো, গেরুয়া রঙের ঘর-বাড়ি ঘাড় উঁচিয়ে হাঁস চরে-বেড়ানো পুকুর ইত্যাদি দেখে যাঁদের পুলকের অন্ত থাকে না– তাঁদের সেই বাংলাদেশে বাস করতে বাধ্য করলে স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশি দেরি হয় না।

স্বপ্নভঙ্গ কতভাবেই না হয়। হতচ্ছাড়া ভিটেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে, কঙ্কালের ছরকুটে নিঃশব্দ হাসির মতো দেখতে বেঢপ দেয়ালগুলোর দিকে চেয়ে আমার একদফা স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়। তখুনি কিন্তু লক্ষ করি রাস্তাটি এই জনশূন্য গাঁয়েই শেষ হয়ে যায়নি। ওই যে, আগাগোড়া ধুলোয় মোড়া উত্তপ্ত রাস্তাটি রোদের মধ্যে এঁকেবেঁকে আরো ভিতরে চলে যাচ্ছে, দু-পাশের মাঠও যেন একটু একটু করে নীচু হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

একসময় যে গাঁয়ে পৌঁছুতে চাই, তার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। আবার ছোটো ছোটো মাটির বাড়ি– তবে এবার বাড়িগুলোর মাথায় খড়ের চাল আছে। আশেপাশে দু-একটি পানি শুকিয়ে-ওঠা ডোবা, কিছু বেঁটে বেঁটে গাছ আর গরু-ছাগলও রয়েছে। অর্থাৎ এই গাঁয়ে মানুষ বাস করছে। পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ কারো দেখা মিলল না। গাঁ-টি বিষণ্ণ, স্তব্ধ– বাড়িগুলোর দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে দেওয়ার গোল গোল চাকা চাকা দাগ। সাইকেলে হেলান দিয়ে হাপরের মতো নিঃশ্বাস টেনে আমি একটু জিরনোর চেষ্টা করছি, সামনের একটি গর্ত থেকে একজন মানুষ আমাদের সামনে দাঁড়ায়। আমি এদেরই সন্ধানে এসেছি, কাজেই লোকটিকে খুব কাছে থেকে দেখার দরকার মনে

amarboi.com

হয়। বলেছি, সে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। কথাটা একটু অতিশয়োক্তি হয়ে গেল বটে। কিন্তু সামনের উঁচু ভিটের একদিকের ঢালুর নীচে গড়ানে জায়গাটার যে ঘরটি ছিল, সেটাকে হঠাৎ আমার গর্ত বলেই ভ্রম হয়েছিল। বড়ো আকারের দেশলাই বাক্সের মতো দেখতে, চারদিকের দেয়াল সাত ফুটের বেশি উঁচু হবে না। ঘরের মাথায় কিছু পুরনো পচা খড় আর শুকনো কাঠিখোঁচা কাঁটা-জঙ্গল চাপানো আছে। ঘরের ভিতরে কী কী সামগ্রী আছে, চোখ বুজে বলে দেয়া যায়। দু-চারটি মাটির শানকি, কানাভাঙা, কালো রঙের একটি মাটির কলসি, একটি বা দুটি মাদুরের অবশেষের মধ্যে গুটিয়ে রাখা শতচ্ছিন্ন কাঁথা। মোটামুটি সামগ্রী এই।

লোকটিকে খুব কাছ থেকে দেখতে থাকি। একে ভালো করে দেখার জন্যেই আমি এই অঞ্চলের প্রকৃতির দিকে অত মনোনিবেশ করেছি। কারণ এই লোকটিই– মানে এই লোকটির মতোই লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানকার প্রকৃতিকে মানবলিপ্ত করেছে, এরই হাত ঝড়ের বেগে উত্তরাঞ্চলের মাঠে মাঠে বয়ে গেছে, নীচের মাটি উপরে উঠে এসেছে, শক্ত মাটি থেকে রস বেরিয়েছে, বীজ থেকে চারা গজিয়েছে, বড়ো বড়ো প্রান্তর সবুজ হয়ে গেছে, ধান ফলেছে, গম ফলেছে। আমি এই জাদুকর, এই অক্লান্তকর্মী বীরকে দেখতে এসেছি। খুব কাছ থেকে তাকে দেখি। সে আমার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শিরদাঁড়া বাঁকা, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, তার গায়ের চামড়া কাঠকয়লার মতো কালো, তার পাঁজর ধনুকের মতো বেঁকে উঠে ঠেলে তুলেছে তার বুক। ঘন ঘাসের মতো কাঁচা-পাকা চুল তার মাথায়। কিছু কপালের উপরে এসে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তার সমস্ত মুখ আচ্ছন্ন। আমি সহজেই ধরে নিতে পারতাম একটা পুরনো বাসি মড়া আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা ভাবার কোনো উপায় ছিল না কারণ তার চোখ দুটি জেগে ছিল। কোটরে-ঢোকা ম্রিয়মাণ, আলো-নেভা দুটি চোখ, সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন নির্বিকার কুচকুচে কালো ভাঁজপড়া মুখের উপর বসানো পিঁচুটি-পড়া এক জোড়া চোখ। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখি।

কে সে? সে উত্তরাঞ্চলের চাষি। এই দেশে তাদের সংখ্যা কোটি কোটি। তাকে বলা যেতে পারে ভূমিহীন কৃষক। তার নাম ভূমিমজুর ও খেতমজুরও বটে, তার দলে ভাগচাষি আছে, ছোটো কৃষক আছে, আছে চাষের বাইরে অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত কোটি কোটি মানুষ। যে প্রকৃতিকে আমার শূন্য মনে হয়েছিল, আসলে এরাই সেই প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ রেখেছে। লোকটির সঙ্গে

কথা বলার আগে আবার তাকে ভালো করে দেখতে ইচ্ছে হলো। সে কর্মী এবং বীর, সমস্ত জীবন সে নিঃশব্দে এক প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে গেছে। লড়াই করেছে বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে। এই কাজ তাকে করতে হয়েছে খালি হাতে বা বলতে পারি শুধু দুটি হাত দিয়েই। তার জমি নেই, ভিটেটুকু পর্যন্ত নেই, হাল নেই, বলদ নেই, হয়তো পরিবার-পরিজন আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত নেই। অন্তত স্বজন বলতে ঠিক কী বোঝায় তা সে কোনোদিন জানতে পারেনি। যে ঘরটির কথা একটু আগে বলেছি সেই ঘরেই বা সেইরকম কোনো ঘরে ১৯১১ সালের দিকে সে জন্মেছিল। সে বলে বড়ো ঝড়ের সময় তার জন্ম হয়েছিল। সে ঝড়ে কবে হয়েছিল আমি জানি না। তবে তার বয়েস তিন কুড়ি বছর হলে আমি ধরে নিচ্ছি ১৯১১ সালেই তার জন্ম হয়েছিল। 'সে খেতে কাজ করছে' ওই হচ্ছে তার প্রথম স্মৃতি। এত ছোটোবেলা থেকে কার খেতে সে কাজ করেছে– আমি জিজ্ঞেস করি। আলো-নেভা চোখ দুটি আমার মুখের উপর ন্যস্ত করে সে আস্তে মাথা নাড়ে। না, তার নিজের খেতে নয়। মহাজনের খেতে। ব্যস– মহাজন। এই একটি চমৎকার শব্দ। জমিদার, মহাজন, একটি শব্দেই সবাইকে বোঝায় সে। এই ঘরটুকু কার ভিটের উপরে? আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলে মৃদু গলায় আমাকে জানায়, মহাজনের। সে জীবনে কোনোদিন কি পাঠশালায় গেছে? একটু-আধটু লেখাপড়া কি সে জানে? না, কখনো সে কোনো পাঠশালায় যায়নি। বিয়ে করছে নাকি লোকটি? হ্যাঁ, তার চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। বেঁচে থাকলে আরো অনেকগুলো হত। তারা বহুদিন আগে মরে ফুরিয়ে গেছে। কেমন করে কে মারা গেছে? আবার আমি জিজ্ঞেস করি। না কোনো ঘটা করে নয়। এমনি এমনি। দীর্ঘ জীবনে কোনো কোনো বছর একটানা ছ-মাস উপোসের অবস্থা এসেছে। সেই সেই বছরেই ছেলে-পিলেরা বেশি মরেছে। এখন যারা বেঁচে আছে তারা কী করে? খেতে কাজ করে। মহাজনের।

আমি সরাসরি বুঝে যাই, আমার হৃৎপিণ্ড মুগুরের মতো আমার বুকে ঘা দিতে থাকে। এর কাছে বাংলা সাহিত্যের কোনো অর্থ নেই। বাঙালি সংস্কৃতির কোনো অর্থ নেই। আমাদের চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা– ট্রেন, বাস, এরোপ্লেন ইত্যাদির কোনো মানে নেই। আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এর কোনো কাজে আসে? আধুনিক জীবন, চিকিৎসা– সব, সব তার কাছে বরবাদ হয়ে গেছে।

জন্ম থেকে মহাজনের ভিটের উপর এই চাপা, ঘুপচি গর্তটির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসবাস করেছে। জোতদারের জমিতে আগে সে একা কাজ করত, এখন ছেলেদের নিয়ে কাজ করে। মনিবের হাল বলদ নিয়ে জমি চষে, ফসল ফলায়, ফসল কাটে, ঝাড়ে এবং মনিবের গোলায় তুলে দিয়ে হাত ঝাড়া দিয়ে হালকা হয়। এই উদয়াস্ত পরিশ্রমের প্রতিদানের একটা হিশেব নিশ্চয়ই আছে– বিঘা পিছু কয়েক মন ধান। কিন্তু সেটা আদৌ জরুরি নয়। যা জানা জরুরি, তা হচ্ছে মোট যে ধান সে পায় তাতে বছরের কয়েকটি মাস স্রেফ পেট ভরে। কথাটা আক্ষরিক অর্থে নিতে হবে। পেট ভরে মানে, পেটই ভরে, জামা-কাপড় হয় না, তেল নুন হয় না, ওষুধপত্র হয় না। কাজেই আবার তাকে মনিবের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। মনিবের ঋণ এ জন্মে সে শুধতে পারবে না। কত যে খেয়ে রেখেছে। মনিবের ঋণ না শুধেই যেদিন তার জীবনের তেলটুকু শেষ হবে, এই ভিটের উপর লুটিয়ে পড়ে ঝট করে তাকে মরতে হবে আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তলায় সেঁধতে হবে।

আমার ধারণা ছিল, আমাদের দেশে ভূমিহীন খেত-মজুর আছে, বর্গাদার আধিয়ার আছে, ছোটো চাষি আছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ক্রীতদাস-ব্যবস্থাও যে বেনামীতে চালু আছে, তা জানা ছিল না। যে লোকটির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাকে কি সপরিবারে ক্রীতদাসত্ব মেনে নিতে হয়নি? তার আর তার সন্তানদের দেহের শ্রমটুকু পাবার জন্যে– যেমন ডিম আর মাংস পাবার জন্যে আমরা মুরগি পুষি বা আরো ভালো, বিনে মাইনের শ্রম পাবার জন্যে মোষ বা গরু পুষি– অবিকল সেইভাবে বাস করার একটা গর্ত দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তবে কিনা গরু মোষ এখন দুর্লভ, তাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করতে হয়। মানুষ তো আর তা নয়। গাদায় গাদায় তাদের মরতে দিলেও শস্তাশ্রমের একটুও কমতি হচ্ছে না। নানারকম প্রথা আর হিশেবের কথা বলা যেতে পারে, লোকটিকে যে আটকে রাখা হয়নি তাও বলা চলে, অনেক কথাই বলা যায়। তবু তাকে পুরুষানুক্রমিক ক্রীতদাসত্ব মেনে নিতে হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের হাতে সে তার জের তুলে দিয়ে থাকে।

সে উত্তরাঞ্চলের এই এলাকার সবচেয়ে নীচুতলার লোক। খেত-মজুর। আধিয়ার, ভাগচাষি, ছোটো কৃষক আর একটু উপরে। এটা হচ্ছে একেবারে খুবই খুঁটিনাটি– আসলে এরা একাকার, গ্রামের পর গ্রাম ছেয়ে আছে, মরছে, ভুগছে, ধুঁকছে, গ্রাম ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছে, শহরে এসে রিকশা টানছে, কলে

কারখানায় ঢুকছে, লঞ্চ ঘাটে, জাহাজ ঘাটে কুলির কাজ করছে, দলে দলে কাজের ধাক্কায় এক অঞ্চল থেকে আর-এক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাদা ঘাঁটছে, নদীতে-খালে মাছ হাতড়াচ্ছে, শস্যদানার খোঁজে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

এখন এদের আপনি বলুন আরো পরিশ্রম করো। এদের বলুন, বাঙালি অলস জাত, পরিশ্রম না করলে, এ জাতের উন্নতি নেই। বলা যাবে কথাটা? কেমন শোনাবে। বলতে একটু লজ্জা লজ্জা লাগবে না!

লোকটিকে আবার খুব কাছ থেকে দেখি। কী প্রচণ্ড পরিশ্রমই না সারাজীবন সে করেছে! শরীরের সমস্ত পেশি দড়ি পাকিয়ে গেছে। শ্রম করা না করা তার কাছে পছন্দের ব্যাপার ছিল না। ছিল বাধ্যতার ব্যাপার। বেঁচে থাকার ব্যাপার। তাকে আরো পরিশ্রম করতে উপদেশ দেয়াটা মরাকে বল্লম দিয়ে হত্যা করার মতো।

উত্তরাঞ্চলের এই মানুষটির গ্রাম সমস্ত এলাকাটায় দূরে দূরে ছড়িয়ে গেছে। একই গ্রাম। এই একই লোক। ধুলোয় ভারি মন্থর পথটি কী ভয়ানক একঘেয়ে, ঘুরে ঘুরে পাকে পাকে গ্রামগুলোকে বাঁধে, আলো থেকে, শহর থেকে, বিজ্ঞান থেকে, সভ্যতা থেকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কতদূরে নিশ্চিন্ত আবর্তের মধ্যে একে ডুবিয়ে দেয়।

আসার সময় মনে হয়েছিল এই এলাকার প্রকৃতি নির্মম, কঠোর, শূন্য। ফেরার সময় বুঝতে পারি, উত্তরাঞ্চলের এখানকার প্রকৃতিতে মানুষের হাত, মানুষের কাজ প্রতিনিয়ত চলছে। প্রকৃতিকে তৈরি করে দিতে হয় মানুষের খাবার, মানুষের প্রয়োজনে যা কিছু লাগে, সবই দিতে হয় তাকে। ভুল করে হঠাৎ যে মাঠ প্রান্তরকে মনে হয়েছিল মানুষের স্পর্শশূন্য নেহায়েতই পৃথিবীর একটি খণ্ডমাত্র, এখন দেখতে পাই তা মানুষেরই সম্পদ আর এই বিশাল সম্পদ ভাগাভাগি করে নিয়েছে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ– জমিদার জোতদার মহাজন যাদের নাম। তারাই আটকে রাখছে এইসব বিশাল প্রান্তর পুকুর, জমি-মাটি– আর তাদের এইসব জমি-মাটি জাল হয়ে গিয়ে ফাঁদে ধরে ফেলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তারা সেখানে মাথা কোটে, নিজেদের হাড়-মাংস-পেশি মাটি করে, বয়েস বাড়ায়, জমি চষে, বীজ বোনে, ফসল কাটে, ফসল ঝাড়ে– তারপর মহাজনের গোলায় তুলে দিয়ে হাত ঝেড়ে নিজেদের গর্তে ঢুকে নির্মম কষ্টদায়ক মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

সূর্য ডুবে গেলেই ছাই রঙের অন্ধকার বড়ো বড়ো মাঠ ঢোকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। রাস্তার ঘন ধুলো ঠান্ডা হতে থাকে। এই সময় আমার আরো

amarboi.com

একবার দৃষ্টিভ্রম হয়। দেখতে পাই, কালো লম্বা মানুষের আশেপাশের সমস্ত মাঠ ছেয়ে ফেলেছে। মুখে কাপড় জড়ানো থাকলেও বোঝা যায় সে উত্তরাঞ্চলের চাষি-সংখ্যায় অগণন, চলছে ফিরছে, নীচু হচ্ছে, সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিঃশব্দ কলরবে মাঠ পূর্ণ হয়ে উঠল– আমি টের পাই, জীবনের তাপে উত্তরাঞ্চলে মাটি কাঁপছে।

শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে

বাংলাদেশের জনপদের যে ছবি আছে মনের মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াই। বরেন্দ্রভূমির গ্রামে গ্রামে ঘুরে মরি। আত্রাই নদীর কূলে কূলে, পদ্মার চরে, মহানন্দার ওপারে দিকহীন সমতলভূমিতে। কোথাও তো তার খোঁজ মেলে না। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে জনপদের কঙ্কাল, মাথার উপরে নির্মেঘ দয়াহীন আকাশ, নীচে শুকনো খটখটে চরচরে হাড় বের হয়ে যাওয়া মাঠ। সে-ও যেন এই বুড়ো পৃথিবীরই কঙ্কাল। মাঠে রুক্ষ ধুলো। এই আষাঢ় মাসেও এক অনির্দেশ্য বাতাসে ধুলোর মেঘ উড়ছে। মাঠে দেখি শস্যের কঙ্কাল। গাঁয়ে-ঘেরা মাঠ নেই, মাঠের কোণে জলাধার নেই, সবুজ ঘাসের গোচারণ নেই, একটিও বটবৃক্ষ নেই, একটিও ছায়া ঘেরা কুঁড়েঘর নেই। নেই নেই, কোথাও কিছু নেই। পড়ে আছে ন্যাংটো মাটি, তাতে রসকস নেই, মাটিতলে জলের আসন নেই– মাটির বুকের মাঝে বন্দি যে জল লুকিয়ে থাকে মাটি পায় না তাকে– মাটি আস্তে আস্তে দাহ্য হয়ে উঠেছে। হয় সে পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে হুড়হুড় করে বসে যাবে, না হয় একদিন দুপুরের রোদে হাউইয়ের মতো আকাশে উড়ে রেণু রেণু হয়ে মিশে যাবে মহাশূন্যে।

এই পটভূমি, এইখানে কিনা আমি খুঁজতে যাই জনপদ, খুঁজতে যাই টলমল পা-ফেলা শিশু, একটুখানি ঠান্ডা ছায়ার উঠোন, ঝিঙে চিচিঙে ফুল, ল্যাজকাটা মোটা কালো কুকুরটিকে, ছোট্ট গোলার নীচে আধোঘুম বেড়ালটিকে খুঁজি কিংবা সেই গ্রাম-বৃদ্ধাকে যিনি ডাল থেকে কাঁকর বেছে ফেলেন, জ্যোৎস্নাভরা উঠোনে যাঁর গলায় রূপকথা কাঁপতে থাকে, জ্যোৎস্নায় যেন ফিঙ ফুটেছে। এখনো কোথাও আছেন কি শিশুর মা? কোলের শিশুর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে যিনি বলেন, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। কোথাও আছে কি শিশুর মুখে দুধের ঘ্রাণ?

জানি কিছুই আর বাকি নেই। রোদের তেজে আমার দু-চোখ পুড়তে পুড়তে এক সময় দু-খণ্ড আগুনের ভাঁটা হয়ে যায়। আমার চোখ থেকে গনগনে আগুনের আঁচ বের হতে থাকে, সেই তাপে আমার নিঃশ্বাসের

বাতাসও শুকিয়ে ওঠে, শেষে বুকের ভিতরেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে এক চুল্লি। বরেন্দ্রের পথের সাদা ধুলোর তাপে পায়ের পাতা দুটিও আগুন হয়ে যায়। তখন দেখতে পাই, এই আষাঢ় মাসের আকাশের মেঘের টুকরোটি যেভাবে শাদা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো আকাশের গায়ে সেঁটে লেগে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি করে এই বিশাল সমতলভূমিতে জনপদগুলোও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব রোগা রোগা শীর্ণ গাঁ-গুলোর কাছে যাবার উপায় নেই। মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ নেই। থাকলেও কখন কোথায় মিলিয়ে গেছে ঠাহর করার উপায় নেই। রোদের আগুনের তাপে পথ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়– একী আশ্চর্য? গাঁগুলোও কি মরীচিকার মতো কেবলই সরে সরে যাবে?

শেষকালে হাঁটতে হাঁটতে তেতোবিরক্ত হয়ে ধরে ফেলি জনপদের কঙ্কাল। ঠিক যেন একখানা ছিঁড়ে যাওয়া মালা– আকার-আকৃতি কিছু নেই, শুকনো ফুল দু-চারটে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কোনো গাঁ দেখতে অবিকল করোটির মতো। দুই চোখে দুই বিকট খোঁদল আর সেখানে ঘন আঁধার। কোনো গাঁ যেন কঙ্কালের নিঃশব্দ বিদ্রূপের হাসি। এমনি এক গাঁয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে সারি সারি পরিত্যক্ত ভিটে। বুকসমান উঁচু কাঁটাজঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ তেলতেলে শাদা মাটির দেয়াল। শুকনো হাওয়ায় সব ধুলো সরে গিয়ে দেয়াল মনে হয় পাথরের তৈরি। কিসের ভয়ে মানুষেরা ভিটে ছেড়ে কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে কে জানে? কিন্তু কোথায় যাবে তারা? ধরা তাদের দিতেই হয়।

ভিটেগুলোর চেহারায় পরিবর্তন দেখা যায় সামান্য– শুধু একসময় খেয়াল হয়, আছে, সেগুলোতে মানুষ আছে। মাটির দেয়ালের উপর ছাউনি আছে কি নেই, ঘরের খড়ের চালার অর্ধেকটাই ঘাড় গুঁজে ঘরের ভিতরেই কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তাতেই যে অন্ধকার সুড়ঙ্গ বা খাঁড়ি বা গর্ত তৈরি হয়েছে সেখানেই মানুষ। কে বলে পরিত্যক্ত জনহীন জনপদ? মানুষ মানুষ মানুষ। নীরব নিঃস্তব্ধ বাকহীন মানুষের মেলা। ঘরের অন্ধকার গর্তের মধ্যে মানুষ, খোলা আকাশের নীচে নিভন্ত উনুনের ধারে স্ত্রীলোক, বৃষ্টিতে গলে-পড়া উদোম পাঁচিলের ধারে টিপ টিপ কালো শিশু, মানুষের অভাব কী? কেউ দাওয়ায় ঘুণ-ধরা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পা তুলে অন্ধকার ঘরের দিকে চেয়ে আছে, কেউ টিপি টিপি পায়ে এক আঁটি খড় টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে। উনুনে শুকনো কাঠিখোঁচা গুঁজে দিয়ে কোনো নারী নিঃশব্দে ফুঁ দিতে দিতে

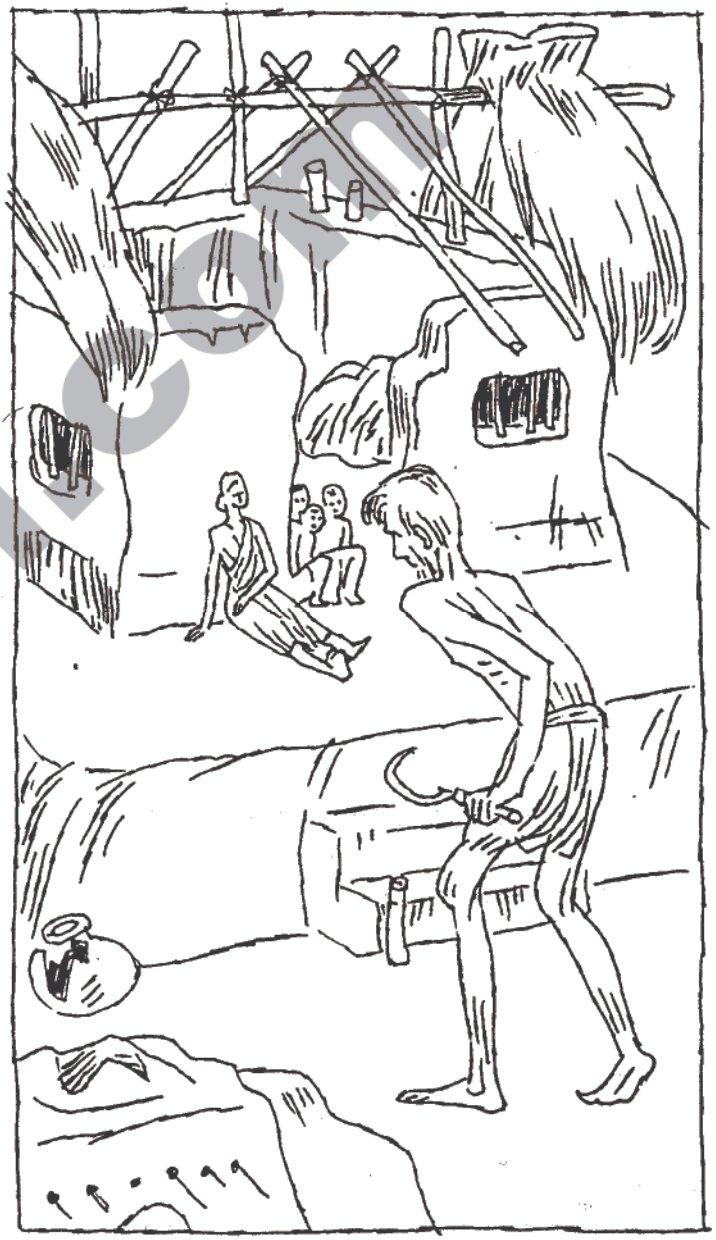

amarboi.com

ফুলিয়ে ফেলছে চোখ। রাস্তার উপর লাঠি হাতে বসে আছে বুড়ি। শত প্রশ্নেও কথা বলে না। নোংরা ও আবর্জনার ঢল নেমেছে রাস্তার উপরে। মানুষ আর গরু-ছাগলের মলের স্রোত ধীর গতিতে রাস্তার ঢালু বেয়ে নামছে, নীচু ভিটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মুরগির দল, সেই নোংরা আঁচড়াচ্ছে দু-পা দিয়ে। মানুষের তো সত্যি অভাব নেই। তবে এদের মানুষ বলা যায় কিনা, এদের মানুষ বলা যাবে কিনা সে আলাদা কথা।

বিকেল গড়িয়ে গেলে সূর্য যখন ডুবু ডুবু তখন আরো মানুষ আসবে চার পাশের মাঠ-ঘাট ঝেঁটিয়ে। দলে দলে পাশাপাশি হেঁটে আসবে মানুষ ঘাড় নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে। নিজেদের মধ্যে তাদের কোনো কথা নেই। তাদের সামনে অন্ধকার রাত। নিস্তব্ধ ভারি জমাট বাঁধা অন্ধকার।

আমি তো এই রকমই এক সন্ধের কোলে গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সেইজন্যেই প্রথমে মনে হয়েছিল এইসব জনপদ পরিত্যক্ত, এইসব ভিটে অলীক। কারণ, জীবনের স্রোত বইছে, অথচ তার কোনো শব্দ নেই এটা ধারণা করা কঠিন। আস্তে আস্তে বুঝতে পারি মানুষের অভাব নেই বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই একা। এরকম আশ্চর্য বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করা কঠিন। পাড়া প্রতিবেশী নয়, এক পরিবারের মানুষ একসঙ্গে বসে আছে, তবু কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। কী সেই বস্তু যা এদের এমন করে বিচ্ছিন্ন করল? সে কি খিদে? লেলিহান খিদের আগুনে তারা প্রত্যেকে একা একা পুড়ছে কি? ওই যে মানুষটি এইমাত্র মাঠ ভেঙে এই পড়ো ভিটেয় এসে ঢুকল হাতে একটি ভাঙা কাস্তে নিয়ে, রং জ্বলে যাওয়া মশারির মতো জাল-জাল গামছা পরে প্রায় ন্যাংটো অবস্থায়, ওর দিকে একবার মাত্র চেয়ে তার মেয়েমানুষটি দাওয়া থেকে উঠে গিয়ে অন্ধকার ঘরের গর্তে গিয়ে ঢুকল কেন? পরস্পরের গায়ে গা দিয়ে গাদাগাদি করে যে তিনটি বালক এতক্ষণ বসে ছিল তারাও তো দেখি একটা কথা বলল না। লোকটিকে একবার মাত্র জরিপ করে তারা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিল। এরপর দেখা যায়, মা এসে বসেছে ছেলেদের কাছে। তারও একটু পরে বাপ ঘর থেকে বেরিয়ে খানিকটা দূরে মাটিতে থেবড়ে বসল। কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে গেছে। খিদের অনুভব উঠে আসছে পেটের ভিতর থেকে উপরের দিকে। কী তীব্র সেই অনুভবের স্বাদ? সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র অবশ করে দেয়, চেতনা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসে, চোখের আলোটুকু নিভে আসে, অন্ধকারের উপর গাঢ়তর অন্ধকারের চাদর পড়ে। খিদের সেই অনুভব তালু ফুঁড়ে নীল বিষাক্ত শিখার মতো বেরিয়ে যেতে

চায়। তাই বুঝি শিশু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মায়ের কাছ থেকে, স্বামী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার মেয়েমানুষের কাছ থেকে, ভাই আলাদা হয়ে যায় ভাই থেকে।

বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু এখন এই পরিবারটিকে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে ঝুপসি ঝুপসি বসে আছে– ঠিক যেন একটি প্রাগৈতিহাসিক গৃহামানুষের দঙ্গল।

এখন এইসব মানুষকে আপনারা মানুষ বলবেন কিনা আমি জানি না। জানোয়ার যে অন্ধকার মধ্যে থেকে সে সব সময়ে জানোয়ারই থেকে যায়, সে ওঠেও না, নামেও না। একমাত্র মানুষই তো দেখি ওঠানামা করতে পারে। এখন আপনারাই স্থির করুন, ভালো ভালো খাবার খেয়ে, বগলে পাউডার লাগিয়ে, নিপিশ করে দাড়ি চেঁছে গালে গন্ধ মেখে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এদের মানুষ বলে ডাকতে পারেন কিনা। যে পরিবারটিকে একটু আগে আপনাদের চোখের সামনে এনে হাজির করেছি, হয়তো আবছা অন্ধকারের জন্যে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু জেনে রাখুন ওই পরিবারের পুরুষ মানুষটি ভূমিহীন। ও সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, সারাদিন ঘুরে কোথাও কাজ পায়নি। আমি আপনাদের শক্ত করে জোর দিয়ে বলছি, ও অলস নয়, ওর বাবার, ওর চৌদ্দ গোষ্ঠীর অলস থাকার কোনো পথ নেই। কারণ কাজ নেই, খাবার নেই, এই হচ্ছে ওর সরল সমীকরণ। খবরদার, ওকে আরো পরিশ্রমী হতে বলবেন নয়, ওই ভূমিহীনটিকে উৎপাদন বাড়াতে বলবেন না। ওকে আপনারা কেউ জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ করতে বলবেন না, একটু লজ্জা থাকলে ওকে কঠোর পরিশ্রমী করার উপদেশ দিতে যাবেন না। আমি বলছি, ও আজ সারাদিন পথের মোড়ে, হাটের মধ্যে, বিত্তবানের বাড়ি বাড়ি বিগতযৌবনা বেশ্যার মতো নিজের শ্রম ফিরি করে বেড়িয়েছে, কেউ কেনেনি। ও খালি হাতে ফিরে এসেছে। গতকাল আট ঘণ্টা কাজ করে ছ-টাকা পেয়ে যে মোটা ভাঁটার মতো চাল এনেছিল তাই সেদ্ধ করে গতরাতে খেয়েছিল। সকাল থেকে ও আর ওর পরিবারের কেউ কিছুই খায়নি। এখন ওরা সবাই বসে আছে। ইচ্ছে হলে ওকে বলুন, ন্যায়-বিচার আর গণতন্ত্র ওর দোর গোড়ায় এনে হাজির করা হয়েছে, ও যেন একটু কষ্ট করে উঠে গিয়ে দোর গোড়া থেকে বস্তুদুটো কুড়িয়ে নিয়ে আসে। কারো কোনো কথায় একফোঁটা কাজ হবে না। আগুনের লেশমাত্র থাকলে সেটাকে উসকে দেওয়া যায়, নতুন জ্বালানি দিয়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বালানোও যায়। কিন্তু চেয়ে দেখুন ওর চোখের দিকে, জীবনের সবটুকু তেল ওর খরচ হয়ে গেছে।

কাঠকুটো ওর মধ্যে যা ছিল তা পুড়ে শেষ হয়ে এখন আগুন নিভে পড়ে আছে ঠান্ডা ছাই। এখন গণতন্ত্র ওর কোলে বসিয়ে দেওয়া হোক বা মাদুলি করে ওর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হোক তাতে ওর কিছু যায় আসে না। তবে সামাজিক ন্যায়বিচার, মূল্যবোধের উজ্জীবন আর গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে ওর মতো লক্ষ কোটি মানুষকে থেঁতলে দুমড়ে মুচড়ে জাতির চলার পথটা সুগম করার চেষ্টা চলতে পারে বটে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অশেষ অনুগ্রহ করে একটির পর একটি যত শাসক এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ওর দিকে নজর দিতে ভুল করেননি। কেউ খুলে নিয়েছেন ওর গায়ের জামাটি, কেউ নিয়েছেন কালো রঙের চামড়াটি, কেউ নিয়েছেন ওর পরনের তহবনটি, কেউ-বা সরিয়েছেন ওর বাড়া-ভাতের শানকিটি। একেবারে পালাপালি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়ে আসছে। খানিকটা নির্মোক নৃত্যের মতো, খানিকটা ঠোকর মেরে খুবলে খাবার মতো। ওর মাংস-মজ্জা-পেশি সব গেছে এক? পেঁয়াজের খোসার মতো পরতের পর পরত। ওর ছাল শুধুই খুলে খাচ্ছে। একসময় ও পঞ্চভূতে মিশে যাবে।

খানের কথা

বাসটা ছাড়বার কথা সোয়া একটায়। দুটো বাজতে চলল, ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। ফাঁকা বাস আস্তে আস্তে ভরে ওঠে। যখন একটা বাজে তখনো দেখি অনেকগুলো সিট খালি। খুব ভালো লাগছিল অনেকদিন পরে ফাঁকা বাসে জানলার ধারে বসে গাঁয়ের দিঘির পাশ দিয়ে ছোটো ছোটো পরিচ্ছন্ন বেড়ার বাড়ির উঠোন ঘেঁষে মাঠ-প্রান্তর হুহু করে পেরিয়ে যাব! কনডাক্টর আমাকে তাড়া লাগাল, নীচে গিয়ে টিকিটটা করে নিন। নিয়ে আরাম করে বসুন। তার কথা শুনে টিকিট করতে যাই। একটা টেবিল সামনে নিয়ে হাতলছাড়া কাঠের চেয়ারে যে মোটাসোটা লোকটি বসে আছে তার কাছে গিয়ে টিকিট চাইতেই নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতো আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে সে টিকিট দিয়ে দেয়। আগেভাগে টিকিট কিনে তাকে যেন কৃতার্থ করেছি, এমনি একটা ভাব করে আমি জিজ্ঞেস করি, বাস ছাড়বে কটায়?

আমাকে একটুও পাত্তা না দিয়ে সে বলল, সময় হলেই ছাড়বে।

আমি বললাম, হ্যাঁ তা তো ছাড়বে কিন্তু ছাড়ার সময়টা কটা? আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

তক্ষুনি একটু প্রমাদ গণেছি। টিকিট নিয়ে বাসে ফিরে এসে দেখি ফাঁকা সিটগুলো প্রায় ভরে উঠেছে। ওদিকে সোওয়া একটা বাজতেও বেশি দেরি নেই। এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়। চারিদিক থেকে পিলপিল করে লোক এসে এই বাসটাতেই উঠতে থাকে। আমার মনে হলো, কী এক সাংঘাতিক আক্রোশে লাঠিসোঁটা নিয়ে লোকজন এটাকেই আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। বাসের ছাদে ধুপ ধুপ করে মাল উঠতে থাকে। শিউরে শিউরে ওঠে গাড়িটা– একজন একটা বাঁশের তৈরি বাঁক দিয়ে দমাদম পেটাতে শুরু করে। গাঁটের পর গাঁট কাপড় ওঠে, টুকরির পর টুকরি পচা চিংড়ি মাছ ; ছাদে এইসব মালপত্রের মধ্যে যেসব ফাঁকফোকর ছিল সেখানে টিপ টিপ মানুষ এঁটে বসে গেল আর বাসের ভিতরে লোক উঠতেই লাগলো উঠতেই লাগলো, শেষে আর ওঠা সম্ভব হলো না। লোকেরা ঝুলতে লাগল বাদুড়ের মতো– যারা

amarboi.com

ঝুলতেও পারল না তারা দূরে দাঁড়িয়ে রইল তাক করে, বাস ছাড়লেই এসে ঢুঁ মারবে।

বহুকষ্টে আমার নাকের সামনে থেকে একটা লোককে ইঞ্চিদুয়েক সরিয়ে দিয়ে ঘড়িতে দেখলাম পৌনে দুটো বেজে গেছে। বাইরের দিকে চেয়ে কনডাক্টরটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, তার টিকি দেখা গেল না। টিকিট ঘরটার দিকে চেয়ে দেখি সেই মোটাসোটা বিড়ালতপস্বীটিও উধাও হয়েছে। কী মোক্ষম জবাবটাই না সে আমাকে দিয়েছিল, সময় হলে ছাড়বে। কার সময় হলে? কে জবাব দেবে এই কূট প্রশ্নের? এখন আমি চাইলেও নেমে যেতে পারি না। এই মনুষ্য-মাংসের দেয়াল ভেদ করবে কে?

দুটো বেজে গেল। বাসের ভিতরের লোকেরা প্রচণ্ড গর্জন শুরু করে দিল। সোয়া একটার বাস কটায় ছাড়বে, আঁ? বলি এখন বাজে কটা ও কনট্যাক্টর? শালার বিটা গেল কনে? আর কতো টাকা খেয়ে পেট মোটা করবা ওরে পিচেশ বাসঅলা। প্রায় সোয়া দুটোর দিকে ভিড়ের চোটে আমি যখন জ্ঞান হারাবার মুখে, তখন ছাড়ল বাস। ভোজবাজির মতো যেমন বাসের লোকেরা উধাও হয়েছিল, প্রায় তেমনি ভোজবাজির মতো ড্রাইভার ইত্যাদি অতি শান্তভাবে এসে গাড়ির দখল নিল। খুব একটা বুকটানা ঘর্ঘর আওয়াজ করে অপারগতার নানারকম ওজর-আপত্তি তুলে বাসটা শেষ পর্যন্ত ড্রাইভারের জেদাজেদিতে রাস্তায় এসে ওঠে। আমি অন্ধ হয়ে বসে রইলাম, চারিদিকে মানুষের দেয়াল।

বাস চলতে থাকে। ওঠে নামে ঝাঁকুনি খায়। ক্যাঁচক্যাঁচ মচ মচ শব্দ তুলে ভারি আওয়াজ করে ইঞ্জিন নিদান হাঁকে– বাস রাস্তার বাইরে চলে যায়, কাত হয়ে পড়ে। রাস্তার পাশে অনেক নীচে খালে শীতকালের হিম ঠান্ডা কালো পানি দেখতে পাই– দমবন্ধ হয়ে ডুবে মরার চেয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডার কল্পনাতে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চায়।

একটি বিশাল বটগাছের নীচে বাস দাঁড়াল। দেখি বর কনে বরযাত্রীসহ একটি পুরো দল। এই বাসেই যাবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীরা এসেছে ওদের তুলে দিতে। আবালবৃদ্ধবনিতা বলতে যা বুঝায় ঠিক তাই। তার মধ্যে বনিতাই বেশি। কনে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে– লজ্জায় কুঁকড়ে আছে– একটা লাল টিস্যুর শাড়ি কোনোমতে গায়ে জড়ানো। থেকে থেকে সরসর করে খুলে পড়ে যাচ্ছে। রং-জ্বলে যাওয়া ব্লাউজটা তখন পুরো দেখা যায়। বেচারা চোখ দুটি বুজে আছে– বুঝতেও পারছে না, যে-কোনো মুহূর্তে

শাড়িটি অঙ্গচ্যুত হতে পারে। দু-পাশ থেকে দুই মধ্যবয়স্কা তাকে ধরে আছে। তাদের মধ্যে একজন মাঝে মাঝে মেয়েটিকে চুমু খাচ্ছে– বোধহয় সেই-ই কনের মা। ভাগ্যবান বরটিকে আমি অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেলাম। তার মুখে রং মাখানো, গায়ে পাঞ্জাবির বোতামগুলো ঠিকমতো লাগানো হয়নি বলে বুকের কাছে দলা পাকিয়ে আছে।

দলটিকে দেখে আমাদের বাস থেকে পৈশাচিক আর্তনাদ উঠল, এত লোক এই বাসে যাবে– অসম্ভব! অসম্ভব তো বটে– কিন্তু যাবে যে এই বাসে তা-ও ঠিক। সত্যিই আমার জীবনের অসম্ভবতম ঘটনা ঘটতে দেখলাম। মোষের মতো গুঁতিয়ে মাথা আর হাত ব্যবহার করে বরযাত্রীর দল রণক্ষেত্রে নেমে পড়ল– তার মানে বাসে উঠে পড়ল। দেখলাম গোল একটা পুঁটলির মতো কনেটিকে কারা ধরে টুপ করে বাসের মধ্যে ফেলে দিল। বরটি তো বেশ ষণ্ডা, সে অবহেলায় বাসে উঠে কনের কাছাকাছি একটা জায়গায় ভিন্নদিকে মুখ করে দাঁড়ায়। কনে আমার পাশেই– এই মহাবিপত্তির কালেও সে বিধিমতোই লজ্জিতা-পাশে কাঁচাপাকা চুলওয়ালা রোগা কালো একটি আধাবয়সি লোক তাকে ধরে থাকে। তাদের কোনো সাহায্যে আসার উপায় ছিল না, শুধু বিব্রত ভাবটা কাটানোর জন্যেই জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ের বিয়ে দিলেন বুঝি?

লোকটি আমার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বেশ প্রস্তুতি নিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল, পুত্রের বেবাহ দে নে অ্যালাম। বুঝলাম ইনি বরের বাপ, সে জন্যেই পুত্রের বেবাহ দে নে অ্যালাম। কনের মুখটাও একবার দেখার চেষ্টা করি– দাঁড়িয়েও সে চোখ বুজে আছে। দেখতে ভালো নয় মেয়েটি, উঁচু দাঁতের ডগাগুলো বেরিয়ে আছে– কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম হাসি রয়েছে মনে হচ্ছে। কী যে সে বুঝেছে, সেই জানে। এই সময় বাসটা এক দিকে কাত হয়ে যায়। ছাড়ার পর থেকে এরকম তো হচ্ছেই– কে আর খেয়াল করতে যাচ্ছে! কিন্তু না, সেই যে অবশ্যঘটনীয় অঘটন যার জন্যে এত প্রস্তুতি, এত হাঁকডাক, এত অর্থব্যয়– তাই এখন ঘটতে যাচ্ছে। বাস কাত হতেই থাকে, তার গতি কমতে কমতে থেমে যায়– কিন্তু সে তিলে তিলে অধঃপতনের দিকে এগোয়। দেখলাম, রাস্তার পাশে গভীর খাদ, তবে তাতে পানির চেয়ে পাঁকই বেশি। মরিয়া লড়াইয়ের জন্যে নিজেকে তৈরি করি।

হ্যাঁ, বাস কাত হচ্ছে– সমস্ত বাসের মানুষ যেন আমাকে লক্ষ্য করেই দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেল, ড্রাইভার বোধহয়

উলটো দিকে দরজা খুলে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর দিয়ে বারবার বিদ্যুৎ খেলে গেল, মানুষের মাংসপিণ্ড আমাকে চার দিক থেকে ঠেসে ধরল, গগনভেদী চিৎকার আমার কানে এল, তারপর শব্দ আবছা, আমি পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ আর অন্ধকারের রাজ্যে এসে ঢুকলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, আশ্চর্য, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। নীচে, খাদের মধ্যে, আমার এক পা কাদায় পোঁতা– শীত গ্রীষ্ম আনন্দ বেদনা কিছুই বোধ হচ্ছে না আমার– নিস্পৃহ দুই চোখ মেলে আমি মানুষ, মানুষের উপর মানুষ, তার উপর মানুষ, তার উপর আবার মানুষ, কাপড়ের গাঁট, মাছের টুকরি-ঢাকা মানুষ, হাতের মধ্যে পা, পায়ের মধ্যে মাথা, লম্বা, চিত উপুড়, গোল, চৌকো এইরকম সব মানুষের তৈরি জ্যামিতির ছক, কাদায় ডোবা, পাঁকে পোঁতা, আঃ আঃ উঃ উঃ হা হা রে– এইসব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে ফাঁকা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকি। ঠিক তখুনি বিদ্যুতের চমক সাঁ করে মাথা থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যায়– দেখি, কনে কেমন করে খুঁজে খুঁজে তার বরকে বের করেছে, কাদা আর পানির মধ্যে ডুবছে সে, কিন্তু প্রাণপণে চেপে ধরেছে তার পালোয়ান বরের গলা। ওই উষ্ণ পেলব দুটি হাত লোহার সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে তার গলায়– সেই চাপে জিভ বেরিয়ে এসেছে ছেলেটার, দুই চোখে মৃত্যুযন্ত্রণা, সে বাতাস চাইছে। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সমস্ত ফুসফুস ভরে বাতাস! এদিকে শ্বাসনালী চেপে ধরেছে তার গতকালের বিয়ে-করা বউ। শেষ পর্যন্ত জীবনসম্মত উপন্যাসে যেমন লেখা থাকে, ঠিক তেমনিভাবে যে মেয়েটির তলপেটে কষে একটি লাথি লাগলো, হিংস্রভাবে দাঁত কড়মড় করে, দু-হাত দিয়ে টেনে সেই সাঁড়াশির দাঁড়াদুটি আলগা করে ফেললো। তারপর হাঁজর পাঁজর করে ডাঙায় উঠে এল। মেয়েটিকে আমি আর দেখতে পাই না।

কিন্তু মেয়েটি শেষ পর্যন্ত উঠে আসে বইকী! ঘণ্টাখানেক বাদে বর-কনেকে একসঙ্গে আবার দেখা যায়। এখন বর ধরে আছে কনের হাত। তারা দাঁড়িয়ে আছে একটু উঁচুতে। এখুনি সে মেয়েটিকে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে একটি বা দুটি মনোরম সরষে ভরা হলুদ মাঠ পেরিয়ে– কোনো গাঁয়ে গিয়ে উঠবে। কিন্তু সমস্ত জীবন ধরে মেয়েটির হাত শুধুই ফসকে যাবে– কেবলই আলগা হবে, শেষে সে তলিয়ে যাবে।

amarboi.com

অপেক্ষা

শুনতে পাই ট্রেনে নাকি গন্তব্যে কখনো পৌঁছুতে পারা যায় না। কথাটা অবশ্যই বাড়িয়ে বলা। আমার ধারণা এমন করে বাড়িয়ে যিনি বলেন তিনি আসলে ট্রেন-জার্নির অকথ্য কষ্টের কথাই বলতে চান। ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটতে পারে– পারে কেন অহরহ ঘটছে, তা বলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারা যাবে না, তা কি কখনো হয়?

ট্রেনে চড়িনি বটে অনেকদিন, তবে সেদিন কী কারণে যেন ট্রেন লাইন ধরে খানিকটা হাঁটতে হয়েছিল। আমার ধারণা ছিল লাইনে তলায় স্লিপারগুলো সমান্তরাল করেই সাজানো থাকে। দেখা গেল আমার ধারণা ভুল, স্লিপারগুলো কখনো কখনো সমান্তরাল রয়েছে বটে তবে আঁকাবাঁকা কোনাকুনিভাবে রয়েছে। অধিকাংশ স্লিপার আস্ত নেই, কালজীর্ণ হয়ে আদ্দেক সিকি হয়ে গেছে। নেহাত খেয়ালবশে দু-একটি স্লিপারে হালকা লাথি লাগালাম। তাতে সেগুলো লাইনের তলা থেকে বেরিয়ে এসে লম্বালম্বি শুয়ে রইলো। আতঙ্কে আমি সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করি, এত নড়বড় স্লিপার, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হবে না? সঙ্গী বলেন, হওয়া তো উচিত।

আমি বলি, উচিত মানে? হয় না তো?

তিনি জবাব দেন, সব উচিত কাজ কি হয়? দোষীর সাজা পাওয়া উচিত। সব সময় কি পায়? বাঃ চমৎকার যুক্তি। সত্যিই, আমি আমার বাসার পিছনের দিকের জানালা খুলে দিলে রেললাইন দেখতে পাই– সারাদিন বেশ কয়েকটি গাড়ি দিব্যি যাতায়াত করছে। দুর্ঘটনার কোনো লক্ষণ নেই। বিশ শতকের এই শেষ নাগাদ নাকি অলৌকিক ঘটনা আর ঘটার উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশে নয়– এখানে অলৌকিক ঘটনা আকছার ঘটছে।

এই ভরসাতেই আমি কিছুদিন আগে ট্রেনে চড়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাংলাদেশের ট্রেন প্রয়োজন হলে চষা জমির উপর দিয়েও যেতে পারবে, রেললাইনের বিশেষ দরকার হবে না। এদিকে ট্রেন নামক লৌহশকটটির উপর আমার আকর্ষণ দুর্মর। ছেলেবেলায় এই একই আকর্ষণ

ছিল গরুর গাড়ির উপর। যদি আপনার তাড়া না থাকে, অন্ধকার রাতে গরুর গাড়িতে চিত হয়ে শুয়ে কালো আকাশের তারা দেখতে দেখতে আর গরুর গলার মৃদু বিষণ্ণ ঘণ্টার শব্দ শুনতে শুনতে আপনি বাড়ির দিকে যাচ্ছেন, একবার ঘুমচ্ছেন, একবার জেগে যাচ্ছেন, আবার ঝিমিয়ে পড়ছেন আর আপনার কল্পনা আকাশের তারায় তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে– এই অভিজ্ঞতা কোনোদিন আপনার হলে গরুর গাড়ির মায়া আপনি জীবনে ছাড়তে পারবেন না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ ট্রেনের। মনে পড়ে কি অন্ধকার রাতে একটি মাত্র চোখের তীব্র আলো জ্বেলে ক্রুদ্ধ দানবের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে যাচ্ছে রাতের রেলগাড়ি, লোহার চাকার সঙ্গে লোহার রেলের ঘর্ষণে উঠছে বিচিত্র শব্দ, শক্ত সেগুন কাঠের কামরা থেকে উঠেছে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, জানালার ধারে বসে আছেন আপনি, হুহু করে রাতের ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগছে আপনার চোখে-মুখে, ছোট ছোট স্টেশনগুলো তীব্রবেগে পার হয়ে যাবার সময় ঘটাঘট ঘটাঘট কর্কশ শব্দ, একবার আবছা দেখলেন স্টেশনঘর, লণ্ঠনের মৃদু আলোয় স্টেশনমাস্টার কাজ করছেন, ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছে, মুহূর্তেই পেরিয়ে গেলেন এইটুকু ছোটো জীবনের টুকরো। আবার আপনার দু-পাশে খোলা মাঠ ঝোপঝাড় বা বিশাল গাছপালার আভাস, গরিব মানুষদের কুঁড়েঘর। এইরকম সময়ে গভীর রাতে একবার মনে করে দেখুন তো– কোথায় যেতে চান আপনি? কিছুতেই ঠিক করে বলতে পারবেন না। কোনো বিশেষ জায়গায় যাওয়াটাই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে আপনার কাছে। আমার তো কেবলই মনে হয়, চলুক এই রাতের ট্রেন, ফুরোয় না যেন এই যেন এই রাত, আর যেন সকাল না হয়, আর যেন দেখতে না হয় পরিচিত পৃথিবীর মুখ।

এত কথা কিন্তু আমার ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে বলছি। বয়েস বেড়ে গেলে অনেককিছুই নষ্ট হয়ে যায়। কিছুতেই ভুলতে পারি না বেলা বারোটায় চড়েছি, এই ট্রেন বিকেল পাঁচটায় পৌঁছে যাওয়া উচিত পার্বতীপুর। বারবার মনে পড়তে লাগলো লাইনের তলায় স্লিপারগুলো আস্ত নেই– এমনকী জোর করে নাটবল্টু দিয়ে আটকানোও নেই রেলের সঙ্গে। মাঝে মাঝে কামরা প্রচণ্ড দুলছে, কখনো কখনো ঢেউ খেলিয়ে এগচ্ছে, ঠিক যেন করোগেটের উপর দিয়ে যাচ্ছে, সন্দেহ হয়, ট্রেন কি সত্যি সত্যিই চষা জমির উপর নেমে পড়ল! সাংঘাতিক ভিড়ে নিজের হাত-পা খুঁজে পাওয়াও মুশকিল ছিল। গাড়ির ছাদে মানুষ ইঞ্জিনের খাঁজে খাঁজে মানুষ এমনকী দুই কম্পার্টমেন্টের মাঝখানেও

মানুষ। বাংলাদেশের গাড়ি অতএব কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ট্রেন যেহেতু জাতীয় সম্পত্তি, কাজেই সবাই নিজের নিজের অংশ খুলে নিয়ে বাড়ি গেছে। ল্যাভেটরিতে ঢুকে দেখি কী আশ্চর্য। বৃটিশ আমলের মতোই কালো কষের কালিতে লেখা রয়েছে, 'আপনার কোনো অভিযোগ থাকলে গার্ডের কাছে বই আছে তাতে লিখুন।' এই বইটা দেখতে কেমন আর কী তাতে লেখা আছে একবার খোঁজ নিতে দারুণ ইচ্ছে হলো। মশকরারও সীমা থাকে।

যাই হোক, আমার রিক্ত হওয়া উচিত নয়। আসলে ট্র্যাডিশন টিকে রয়েছে দেখে আনন্দিতই হওয়ার কথা। ট্রেনের সঙ্গে বহুদিনের যোগাযোগ নেই, সেজন্যে ইতিমধ্যে ট্রেন নামক শকটটির যে বিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না।

উত্তরবঙ্গের খোলা মাঠের উপর দিয়ে দিনে-দুপুরে ট্রেন এসেছে। রোদের জন্যে হাওয়া গরম– সেই গরম হাওয়া উড়িয়ে এনেছে সাদা ধুলোর মেঘ। জানালার কাঁচগুলো নামিয়ে দিয়েও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না। ধুলো অপ্রতিরোধ্য। কামরা ধোঁয়াটে কুয়াশার ভরে যায়– চারিদিক থেকে খক খক করে শুকনো কাশির শব্দ আসতে থাকে। যতটা সম্ভব নিস্পৃহ থেকে মোটা অস্পষ্ট কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকি, দেখতে পাই ধুলোমাখা গাছপালা, ধুলোমাখা নোংরা মানুষজন, ধুলোর ঘন পর্দায় ঢাকা বাড়িঘর। উত্তরবঙ্গে বড়ো গাছের সংখ্যা কম। তা কি এখন আরো কমে এসেছে?

যাক এসব কথা। পার্বতীপুর গিয়ে আমাকে ট্রেন বদলাতে হবে। সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল পার্বতীপুর থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে ঠিক পাঁচটায়। হিসেব করে দেখলাম পাঁচটার কিছু আগেই আমাদের ট্রেন পৌঁছুতে পারবে সেখানে। সত্যিই যখন পার্বতীপুরে ট্রেন গিয়ে থামল, তখনো পাঁচটা বাজেনি। খুবই হন্তদন্ত হয়ে আমি ট্রেন থেকে নামি, দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াই একটি স্টলের সামনে, মালিককে জিজ্ঞেস করি, দিনাজপুরের ট্রেন কোথায় দাঁড়ায়? ছেড়ে চলে গেছে কি?

স্টলের মালিক অমায়িক হেসে উত্তর দেয়, এক্ষুনি আসবে দিনাজপুরের ট্রেন– এক্ষুনি আসবে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায় দাঁড়াবে?

সে লোকটি উত্তর দিল, আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ওইখানে, ওই প্লাটফর্মেই। আপনার কোনো ভাবনা নেই।

আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়ে মালিককে বলি, এক কাপ চা হবে কি?–

amarboi.com

এই কথা বলে আমি লোকটিকে পরখ করে দেখতে থাকি। কালো ছিপছিপে মাঝবয়েসি মানুষ। গায়ের রং কালো, গলায় কণ্ঠি আছে, দাড়িগোঁফ নিখুঁত করে কামানো। ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষটি। আর তেমনিই চটপটে। মুহূর্তেই চা তৈরি করতে লেগে গেল। তার স্টলের ভিতরে একটা বেঞ্চ পাতা আছে। উঁচু কাউন্টারের বাইরেও একটা আছে। দুটোই ফাঁকা। কাউন্টারে কনুইয়ের ভর রেখে আমি লোকটির কাজ করা দেখতে থাকি। বিশেষ কাজে দক্ষ মানুষের কাজ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

চা-টা মুখে দিয়েই আমি বুঝতে পারি স্টলের চা যতটা ভালো হওয়া সম্ভব, এটা তাই। চা শেষ করে একটু উদ্‌বেগের সঙ্গে আমি মালিকটিকে আবার জিজ্ঞেস করি, দিনাজপুরের ট্রেন তো পাঁচটায় ছেড়ে চলে যাবার কথা— সোয়া পাঁচটা বাজল, এখনো প্লাটফর্মে গাড়ি লাগাল না। অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে চলে গেল না তো?

অন্য একজন খদ্দেরকে জলদি চা বানিয়ে দিতে দিতে চটপটে লোকটি বলল, না না, গাড়ি এইখানেই লাগবে— কখনো কখনো একটু দেরি হয়। বসুন আপনি বেঞ্চটাতে। বলতে বলতেই কোথা থেকে নোংরা হাফ-শার্ট গায়ে লুঙ্গি-পরা এক লোক এসে গায়ে পড়ে বললো, কোথা যাবেন? দিনাজপুর? আমিও যাব। এই প্ল্যাটফর্মেই গাড়ি আসবে।

অগত্যা কী করা যায়! বেঞ্চের উপর ঝোলাটা নামিয়ে রেখে বসে পড়ি। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। শেডের নীচে লোহার খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে দারুণ রূপবতী বাইশ-তেইশ বছরের একটি গ্রামবধূ। পাশেই পোকায় খাওয়া একখণ্ড কালো ডালের মতো একটি লোক। খালি গা, একফালি ন্যাকড়া লুঙ্গির মতো কোমরে জড়ানো। কাপড়টুকুকে ঠেলে সে জানুর একেবারে শেষপ্রান্তে নিয়ে গেছে। চিবুকের কাছে সামান্য কিছু দাড়ি। চোখদুটো একেবারেই নেভা। এক আশ্চর্য শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে। পাশে আগুনের মতো রূপসি সেই যুবতি। একটা রঙিন নোংরা শাড়ি দিয়ে যতটা পারছে নিজের রূপ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। আমি প্রথমে ভাবলাম, লোকটি বোধ হয় মেয়েটির বাবা বা চাচা হবে। কিন্তু বিড়বিড় করে দু-একবার কঠিন কণ্ঠে সে মেয়েটিকে যা বলল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা স্বামী-স্ত্রী। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে চেয়ে এই মূর্তিমান অসংগতিটিকে দেখলাম।

সময় চলে যায়। আশেপাশে ইঞ্জিনের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু কিছুই ঘটে না। মরিয়া হয়ে স্টলের মালিকটিকে আর এক কাপ চা

দিতে বলি। সেই সঙ্গে আর একবার তাকে অস্থির প্রশ্ন করি, কখন আসবে আপনার পাঁচটার ট্রেন? লোকটির এতটুকু ধৈর্যচ্যুতি হয় না, খুবই শান্ত কণ্ঠে সে বলে, আসবে আসবে।

এর মধ্যে সূর্য ডুবে যায়। স্টেশনের লোকজনের সংখ্যা আরো কমে আসে। ম্লান লাল আলোয় প্ল্যাটফর্ম ভরে গেলে সেই আলোয় গ্রামবধূটির অসামান্য রূপ জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে। তার পাশে ক্ষয়-পেয়ে-যাওয়া স্বামীটি পরনের ন্যাকড়াটি আরো উপরে তুলে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে বসে থাকে।

আমি ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। কোথায় যাবে এই দম্পতি? নাকি তারা এখানেই থাকে? এই সময় বাহুদুর থেকে একটি ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসে। আমার আশা হয় আমাদের ট্রেন আসছে। চট করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি আবার স্টলের মালিকটিকে জিজ্ঞেস করি, ওই বোধহয় আমাদের ট্রেন?

লোকটি শান্তভাবে বলে, না, কোনো ইঞ্জিন শান্টিং করছে। আমি আবার বসে পড়ি। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় প্লাটফর্ম ধোঁয়াটে হয়ে আসে। দম্পতিটিকে আর ভালো করে দেখতে পাই না— শুধু বুঝতে পারি, তারা অপেক্ষা করছে। স্টলওয়ালা একটা পরিষ্কার হ্যারিকেন জ্বালায়। এই সময় আমি একজন রেলের ইউনিফর্ম পরা লোককে পাকড়াও করে ফেলি, বলুন তো, দিনাজপুরের ট্রেন কখন আসবে— ক'নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়াবে?

লোকটা অনির্দিষ্টভাবে আঙুল তুলে শুধু বলল, উই যে উইদিকে। বলে আমি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার আগেই ধূসর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভাবলাম প্রথম শ্রেণির বিশ্রামকক্ষে গিয়ে একটু অপেক্ষা করি। খোঁজটাও নিশ্চয় পেয়ে যাব। সেখানে গিয়ে দেখি দু-জন লোক পুঁটলি খুলে খাবার বের করছে। আমাকে দেখে খুবই আন্তরিকভাবে রংপুরের ভাষায় বলল, আসেন, আসেন— ট্রেনে যাবেন? বসেন। আমি বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে বললাম, দিনাজপুরের ট্রেনে যাব। হামরাও যামো— বলে ওদের একজন আমার দিকে চেয়ে আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

অন্যজন বলল, ব্যস্ত হন ক্যান— বলে বিরাট একথাবা মুড়ি মুখে তুলে হাতের কাঁচা পেঁয়াজে কচ করে একটা কামড় দিয়ে ফের আশ্বাস দিল, হামরাও যামো— টেরেন হামাদের ফেলে যাবে কোনটে? আইসেন নাস্তা করেন। এই কথা বলে ওরা দু-জন যে পুঁটুলি থেকে মুড়ি খাচ্ছিল, সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বহুকষ্টে তাদের নিবৃত্ত করি। এই সময় এক চেকার এসে

ওয়েটিং রুমে ঢোকে। আমি প্রমাদ গণি। নিশ্চয় এরা বিনা টিকিটের যাত্রী– অন্তত প্রথম শ্রেণির যাত্রী তো নয়ই। একটা কেলেঙ্কারি না হয়ে যায় না। কিন্তু ওদের মধ্যে যে সুপুরুষ যুবকটি আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল, সে চেকার ভদ্রলোকটিকে দেখেই 'চাচা' বলে লাঠিয়ে উঠল, এবং বিনা সংকোচে তাঁকে মুড়ি খাবার আমন্ত্রণ জানাল। অতঃপর এই অসম্ভব চাচা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের অবিরত আন্তরিক আলাপের মাঝখানে আমি একবার জিজ্ঞেস করি, দিনাজপুরের ট্রেন কখন আসবে? ভদ্রলোক উত্তর দেন, কিছুই বলা যায় না। না-ও আসতে পারে। আমি বলি, তার মানে?

তিনি বলেন, ইঞ্জিন ফিঞ্জিন নেই। সব ইঞ্জিন খারাপ হয়ে আছে। কেউ কারো কথা শোনে না। আপনার গাড়ি ঠাকুরগাঁও থেকে আসবে। কাল রাত দুটোয় গেছে– কখন ফিরবে কেউ জানে না।

মুড়িভক্ত ছেলেটি মহা উৎসাহে তর্ক চালিয়ে যায়। সে বলে ট্রেন এক্ষুনি আসবে। এই সময় মাইক্রোফোনে বিকট গলা ভেসে আসে। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনি। নিশ্চয়ই ট্রেনের খবর হচ্ছে। শুনতে পাই দশ বছর বয়েসের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে– এই প্ল্যাটফর্মেই ছিল। তার মামা তাকে খুঁজছে। কেউ পেলে যেন ছেলেটিকে এক্ষুনি তার মামার কাছে পৌঁছে দেয়। প্ল্যাটফর্মে ১৫/২০ জন মানুষ– একবার চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় কেউ হারিয়ে গেছে কি-না। কিন্তু এই কথা নিয়ে মাইক্রেফোনের লোকটা গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচায়। তখন দাঁত বের করে হি হি হাসতে হাসতে একটি বছর দশেকের ছোঁড়া আমার চেয়ারের পেছনে এসে লুকোয় আর বলে, হামাকে খুঁজছে মামা।

আর কিছুতেই সহ্য হয় না। সাড়ে ন-টা বেজে গেছে। আমি স্টেশন মাস্টারের রুমে ঢুকে পড়ে সেই সেই নিরীহ প্রৌঢ়টিকে জিজ্ঞেস করি, দিনাজপুরের ট্রেন বলে কিছু আছে কি না? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছে?

তা হলে সেটা কখন কোথা থেকে ছাড়বে?

বলতে পারি না।

তার মানে? আমি বলি, আপনি একটা জংশন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। আপনি বলতে পারবেন না কেন?

বলতে পারি না এইজন্যে যে ইঞ্জিনগুলো প্রায় সবই খারাপ। দু-একটা যদি ভালো থাকে আর ড্রাইভার যদি রাজি হয় তা হলে এইসব লোক্যাল ট্রেন চলতে পারে। কাজেই আমি কিছু বলতে পারি না। আমাদের এখানে

সব কিছুই কোল্যাপ্স করেছে– কোল্যাপ্স, বলে দু-হাত উল্টে দিয়ে স্টেশনমাস্টার বিকট মুখভঙ্গি করে আমার দিকে চেয়ে থাকেন।

আমি ফের আমার চেনা স্টলটায় ফিরে আসি। দেখি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মালিকটির ঝকমকে হ্যারিকেন ভালো আলো দিচ্ছে– একটি কালো রঙের যৌবনপ্রান্তে-পা-দেওয়া রহস্যময়ী স্ত্রীলোককে সে খুব তোয়াজের সঙ্গে চা তৈরি করে খাওয়াচ্ছে। গ্রামবধূটি ঘুমিয়ে পড়েছে প্রায় বিভোর হয়ে। পাশে বসে নিভন্ত চোখে পোকায়-খাওয়া ক্ষয় পাওয়া মানুষটি। আমি আর এক কাপ চা চাইলাম।

amarboi.com

দূরবাসী

বাসটাকে বেজায়গায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম। যেখানে সেখানে আজকাল আর বাস দাঁড়াতে চায় না। আমাকে কনডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়েছে। সঙ্গে জিনিশপত্র তেমন নেই– পেটফোলা ব্যাগটা হাতে নিয়ে মাটিতে পা দেবার আগেই বাস ছেড়ে দেয়। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে আমি সামলে নিলাম। বাসের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে আসা একঝমট পাইপ থেকে কুচকুচে কালো ধোঁয়া এসে কিছু আমার নাক-মুখে ঢোকে কিছু আমার জামা-কাপড় মলিন করে দেয়। মুখের ভিতরে ধোঁয়াটে আলুনে স্বাদ, গলার মধ্যে শুকনো কাঠে কাঠে ঘষার মতো খক খক নীরস কাশি আর একটা মোটা সেদ্ধ অসাড় জিভের অনুভূতি নিয়ে আমি একেবারে হঠাৎ-ই খেয়াল করি আমাদের দেশের বাড়ির রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

ধোঁয়ার মতো নোংরা জলকণাহীন মেঘে সমস্ত আকাশ ঢাকা, সূর্যের দেখা নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরমে গাছপালা থমথম করছে। আমি একবার হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়েও যেন যথেষ্ট অক্সিজেন পেলাম না। পায়ের নীচে ঘাসপাতা সকালের মৃদু বৃষ্টিতে ঘেমে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। একবার আকাশের দিকে একবার চারপাশের প্রকৃতির দিকে আমি অন্যমনস্কভাবে চেয়ে দেখি। মনে হয় না আমি দেশে ফিরছি। কোথাও কিছু নেই– নিজের দেহের ভিতরটা মনে হয় জং-ধরা পুরনো মেশিন– বহুদিন তেল দেওয়া নেই, কেউ যন্ত্রপাতিগুলো ধোয়ামোছা করেনি। সর্দিবসা গলার আওয়াজের মতো শব্দে ফুসফুসের ওঠা নামা টের পাই। টের পাই পুরনো ঝরঝরে হৃৎপিণ্ডটা যেন বোঁটা থেকে খুলে আসছে। আমার মনে হয় না আমি দেশে ফিরছি।

রাস্তা পেরিয়ে পিছনে বড় মাঠটার দিকে বহুকষ্টে চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখার চেষ্টা করি। একফোঁটা সবুজ চোখে পড়ে না। বেঢপ কতকগুলো চিমনি থেকে আবার সেই কালো ধোঁয়া উঠছে। মাঠটায় ইটের ভাঁটা তৈরি হয়েছে অনেকগুলো। নীচের মাটি খুঁড়ে উপরে আনা হয়েছে। মাটির তলায় বড়ো বড়ো সুড়ঙ্গ– বিকটাকৃতি ডাইনোসরের মরা দেহের মতো খুঁড়ে তোলা

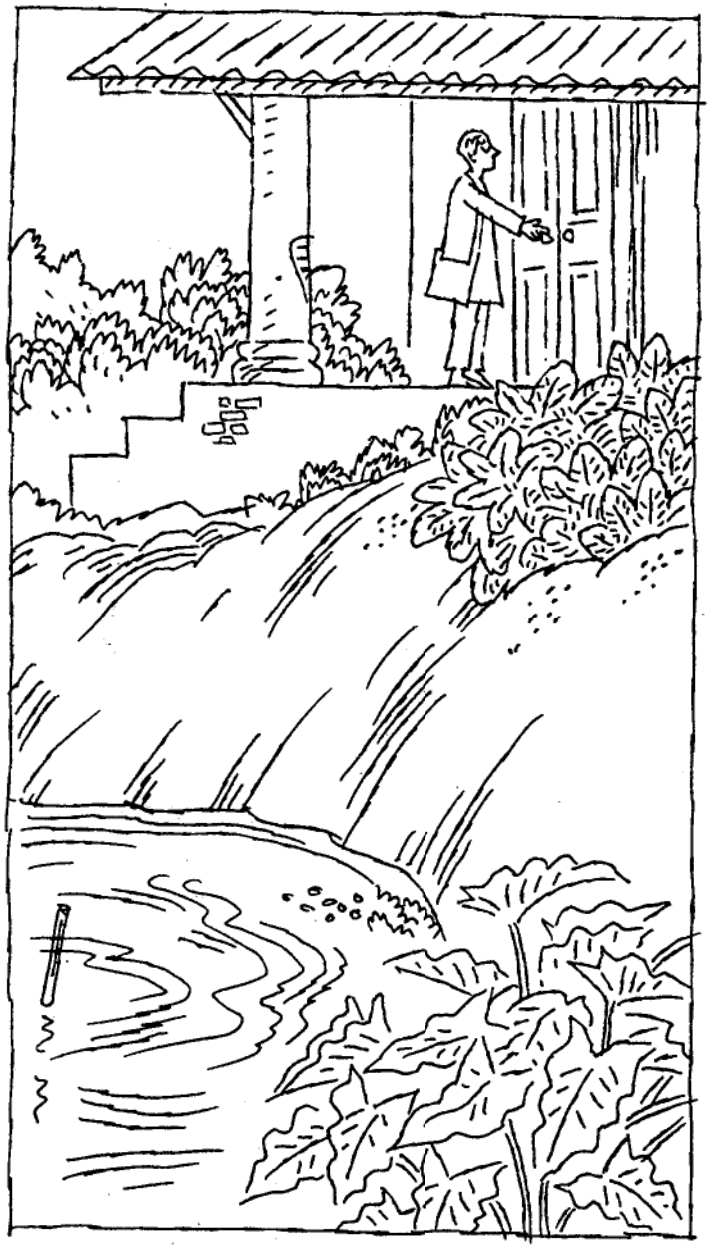

মাটি পিঠ উঁচু করে আছে। ভিতরটা ফোঁপরা, কোথাও পোড়ামাটির ধস নেমেছে। যতদূর চোখ চলে এইরকম লাল পোড়ামাটির ধস– এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনীচু জনহীন দুর্গম। চোখ ফিরিয়ে নেই, মনে পড়ে যায় এই ঘনসবুজ মাঠটা চিরে একটা সরু শাদা পায়ে-চলা রাস্তা দিগন্তের কাছে গিয়ে একটু উঁচু হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠত। এত স্পষ্ট যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে। এখনকার মাঠটার চেয়ে সেই মাঠটা বেশি সুন্দর ছিল কিনা জানি না, শাদা সরু রাস্তাটা চোখের উপর ফুটে উঠল এখন। এইমাত্র।

আমাকে যেতে হবে। বাড়ি যাবার রাস্তার মোড়ে কেউ এমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। মোড়ের উপরেই একটা বটগাছ। গুঁড়িটা বাঁধানো। একটা চাতালের মতো। ইচ্ছে করলে খানিকক্ষণ বসে থাকা যায়। দু-পা এগিয়ে চাতালে পা রেখে দাঁড়াই। সিমেন্টের মেঝে ফেটেচেটে একাকার। সেখানে সেখানে বড়ো বড়ো চারাগাছ গজিয়েছে। অত বড়ো গাছে কোনো পাখি নেই।

আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। কী সাংঘাতিক ভারী। অথচ কিছুই তো প্রায় ব্যাগে নেই। ব্যাগ তো খালি একরকম। তখন খেয়াল করে দেখি ব্যাগ খালি, মাথার ভিতরটা খালি, বুকের ভিতরে কতকগুলো জবরজং যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই। কিছুই নেই– কোনো প্রত্যাশা নয়, কোনো অভাবিত আনন্দ নয়, কোনো প্রাপ্তির আকাঙ্খা নয়। আমি আমার বুড়ো মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। হ্যাঁ, এতক্ষণ আমার কিছুই মান পড়ছিল না– এইবার মনে পড়েছে, বহুদিন দেশের বাড়িতে আসা হয়নি, দেখা হয়নি মা-বাবার সঙ্গে, তাঁরা যে কোনোদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারেন। ওঁদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। কেন দরকার? মনের ভিতরে হাতড়াতে থাকি। বড়ো বড়ো ফাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না, আর কোনো কিছুই চোখে পড়ে না।

মনে পড়ে ছোটোবেলায় দূর থেকে একটি ট্রেনকে মাঠের কিনারা বেয়ে টিক টিক শব্দে চলে যেতে দেখে কী অদ্ভুতই না লেগেছিল। অসম্ভব সুন্দর কারুকাজ করা একটা গালচে চোখের সামনে খুলে যাবার মতো– খুলতে খুলতে আর শেষ হতে চায় না। বটগাছের তলায় ফুটিফাটা সিমেন্টের মেঝের উপর বসে– পিছনে পোড়া লাল মরা মাঠ, ছয়টনি ট্রাকের মাটি-কাঁপানো গভীর আওয়াজ, ধোঁয়া-মাখা গাছপালা আর বর্ষণ-সম্ভাবনা শূন্য আধো-অন্ধকার ছাই-রয়ের আকাশের পটভূমিতে ছেলেবেলাকার সেই গালচে-খোলার ব্যাপারটা মনে পড়ে আমার হাসি পেয়ে যায়। ভবিষ্যতের

আর সামান্যই খুলতে বাকি– তবে আন্দাজ করা যাচ্ছে সহজেই। এখন আর ওটা গালছে নয়, একটা বড়ো বস্তা, অন্ধকার পোরা আছে, একদিন শিগগিরই বস্তাটার মুখ খুলে যাবে, আমি সুড়সুড় করে গিয়ে বস্তাটার মধ্যে ঢুকব, মুখটাও যাবে ঝপ করে বন্ধ হয়ে। আর যেটুকু ইতিমধ্যে খুলে গেছে, কী কদর্য সেটা– কী কদর্য।

ছোটো ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার পা-দুটো টলমল করতে থাকে। বটগাছের তলার চাতাল থেকে রাস্তা সোজা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তার মাঝখানটা উঁচু, দু-দিকে ঢালু, সকালের বৃষ্টিতে সামান্য পিছল। এইবার আমি আমার মা-বাবার কাছে যাব।

সত্যিই পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। রাস্তাটা একটু এগোলেই চারদিক এমন স্তব্ধ হয়ে আসে। দু-চারটি ছোটো ঝোপ-জঙ্গল, খানিকটা পড়োজমি, কয়েকটা বসতিহীন ভিটে, পরপর তিনটি অন্ধকার বাঁশঝাড় পার হলে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই এইভাবে কি প্রেতের জগতে চলে আসা যায়? প্রেতদের হাঁটতে দেখা যায়? চাই কী কথাবার্তাও শোনা যায়? রাতে শকুনের ছানা মানুষের বাচ্চার মতো কাঁদে, সমস্ত দুপুর কর্কশ গলায় একটানা কাক ডেকে যায়। বাঁদিকে চেয়ে আমাদের বাড়িটা চিনতে পারি। অনেকদিন আসা হয়নি, তবু চিনতে পারি, ডোবার কালো পচা পানি স্থির হয়ে আছে, পাঁকের মধ্যে কাঁকড়া বা কোনো মাছ বজবজ শব্দে বুদবুদ তোলে।

আর কোনোদিকে না চেয়ে আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে প্রাণপণে কড়া নাড়ি। চারদিকে নির্জনতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে। আমার নিজেরই দু-কানে তালা ধরে যায়– কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়ি না, কড়া ধরে ঝাঁকাতেই থাকি, ঝাঁকাতেই থাকি।

থপ থপ মৃদু মন্থর পায়ের শব্দ আসে, বন্ধ দরজার পিছনে খুট করে আওয়াজ হয়, তারপরই একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আমার কানের কাছে ফেটে পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুইচোখ আমি একাগ্র খুলে রাখি, খাড়া করে রাখি দুই কান, এমনকী জং-ধরা হৃৎপিণ্ডটি পর্যন্ত ধক ধক করে চলতে শুরু করে। কার সঙ্গে আমার দেখা হবে? মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাই।

দরজা খুলে যায়। খুব আস্তে আস্তে খোলে– এ বাড়ির দরজা আবার সাবেকি ধরনের লোহার হাঁসকলের উপর বসানো। যতক্ষণ দরজা খোলে, একটানা বিচ্ছিরি একটা শব্দ হতে থাকে। সম্পূর্ণ খুলে গেলে পিছন থেকে এমন একটা চাপা শাদা আলো আসে যে আমি ভালো করে কিছুই দেখতে

amarboi.com

পাই না। দরজার ওপারে ঘরের মেঝেয় যে দাঁড়িয়ে তাকে আবছা দেখতে পেলাম মাত্র। আলোটা চোখে আর একটু সয়ে এলে যখন তাঁকে ভালো করে দেখতে পাই, তখন যে কিছুতেই চিনতে পারি না। আধময়লা শাদা শাড়ি পরা কোলকুঁজো ছোট্টো মানুষটি কতদূরে দাঁড়িয়ে– এতদূর এলাম, কিছুতেই মেঝেটুকু পেরিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারি না। দরজায় হাতের ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি বললেন, কে? তাঁর গলা আমার কানের কাছে ফিশফিশ করে উঠল। আমি তাঁর নষ্ট ঘোলা চোখদুটি দেখলাম। একটু সময়ের মধ্যে বড়ো বেশিই দেখে ফেললাম। মুখের চামড়ায় ধরেছে পোড়া কালো রং, অসংখ্য ভাঁজে জীর্ণ কাগজের মতো রসহীন কপাল, শণের নুড়ির মতো পাকা এলোমেলো চুল– এই সব কিছুই বড়ো দ্রুত দেখে ফেললাম আমি।

আমার মা আবার বললেন, কে? কে কড়া নাড়ছে?

আমি নিজের নাম বলি। বলে কী ঘটে দেখার জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কী কী ঘটতে পারে ভাবতে গিয়ে অসম্ভব ক্লান্তি লাগে আমার।

আমার নামটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটবে ভেবেছিলাম তা ঘটল না। মাটির উপরে ছোট্টো ঢিবির মতো জেগে-থাকা আমার মায়ের চোখে একটু আলোও দেখা গেল না, মুখের কোনো রেখাও কাঁপল না, তিনি আমার নামটা দু-বার উচ্চারণ করে বললেন, জাহিদুল কে?

যাক, বাঁচা গেল। অবস্থা আমার চেয়ে একটুও ভালো নয়। নিজের ছেলের নামটাও ভুলেছেন দেখা যাচ্ছে। আমি মৃদু গলায় আমার ভালো নাম আর ডাক নাম দু-বার করে চারবার বলি।

ওমা, তাই তো, তোতা, আমি বলি কে বুঝি! মা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন, সম্ভব হয় না। নিজের বেতো অথর্ব শরীরটা নিয়ে তিনি হাজর-হাজর করে আমার দিকে এগিয়ে এসে প্রথমে দু-হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধরেন। খরখরে শুকনো হাত একটুকরো শিরীষ কাগজের মতো আমার হাড়ের উপর দিয়ে চলে যায়। তাঁর মুখের ভাঁজগুলো আরো ট্যারাব্যাঁকা হয়ে ওঠে, আমার বুকের কাছে তাঁর শাদা মাথাটা ঘনঘন ঝাঁকুনি খেতে থাকে! আমি বুঝতে পারি, তিনি কাঁদছেন, কিন্তু চোখের কোণে পানি দেখতে পাই না। এলোমেলো হাত চালিয়ে তিনি তাঁর তালু আমার কানের উপর রাখেন। তারপর কী অসম্ভব ব্যাকুলতার সঙ্গে আমার মাথাটা টেনে নামিয়ে, টেনে অনেকটা নামিয়ে আমার গালে শব্দ করে চুমো খান– তারপর অন্য গালেও।

আমি কেন স্তম্ভিত হয়ে যাই? কেন স্তম্ভিত হয়ে যাই? আমার দু'গালে শক্ত তারের মতো কাঁচাপাকা দাড়ি। ঘামে ধুলোয় একটা মোটা আস্তর পড়েছে। নিশ্চয় টক আর নোনতা স্বাদ লেগেছে মায়ের জিভে। এই গালে চুমো। আমার কেমন লাগছিল আমি জানি না। প্রচণ্ড অদৃশ্য চড়ের ভয়ে দু-গাল যে আমার সবসময়েই সিঁটিয়ে থাকে। মায়ের মুখের লালায় সেই গাল একটু ভিজে যায় আর কানের কাছে আবার ফেটে পড়ে সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ– মরুভূমির হাওয়ায় মতো। যার উপর দিয়ে যায়, শুষে নেয় তার রসটুকু।

এমনি করে মা আমাকে নাড়াচাড়া করতে থাকেন, ভিজিয়ে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি কিছুই বোধ করি না, কোথাও নাড়া খাই না, কিছুই জেগে ওঠে না, ব্যাগ কাঁধে জানোয়ারের মতো দাঁড়িয়ে থাকি– কিছুতেই যোগাযোগ হয় না।

মা জড়িত গলায় বলে যান, কেমন আছিস বাবা? ভালো ছিলি? এতদিন আসিসনি কেন? এলি তা হলে?

আমি বলি, তোমরা কেমন আছ? নিজের গলার শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠি। করাত দিয়ে কাঠ চেয়ার আওয়াজ পাই যেন।

এই সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে চাপা তীব্র গোঙানির শব্দ আসে। মুহূর্তের মধ্যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে মা পাশের ঘরে ঢোকেন। আমি জানি, সেখানে বাবা আছেন। ব্যাগটা আর কাঁধ থেকে নামাই না– ঘরে গিয়ে ঢুকি। দরজা জানালা সব বন্ধ– ঘর অন্ধকার, কাজেই প্রথমে কিছু চোখে পড়ে না, শুধু কাতরানির শব্দ কানে আসে। একটু পরে দেখি দু-হাত দিয়ে নিজের ডান জানু ধরে বাবা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। কতটুকুন মানুষ, কত ছোট্ট দেখাচ্ছে তাঁকে, ঘরে একটা জোর হাওয়া উঠলে শুকনো কাঠির মতো মচকে যাবেন। সামনের দিকের দরজাটা আমি খুলে দেই। যেন অনেকদিন পর আলো লেগেছে– এভাবে তাঁর অবোধ চোখদুটি মিটমিট করতে থাকে। তখন আমি দেখতে পাই, টেবিলের উপর থেকে এক টুকরো ভারী লোহা কী করে তাঁর ডান পায়ের আঙুলের উপর পড়েছে– টুকরোটা গড়িয়ে চলে গেছে অনেকটা দূরে, আঙুলটা একেবারে থ্যাঁতলানো। মা কেবলই অস্থির প্রশ্ন করতে থাকেন, কী হয়েছে? কিন্তু একবারও বুঝতে চেষ্টা করেন না। রাগে আমি ফেটে পড়ি, কী কাজে এই লোহার টুকরোটাকে টেবিলের ওপরে রাখা হয়েছে? আর তুমি গেলেই বা কী করে ওটার কাছে?

আমার চিৎকারে বাবা গোঙানি থামিয়ে ফেলেন। আমার মনে হতে থাকে

পায়ের আঘাতের পুরো খবর তাঁর মগজে পৌঁছোয়নি– কীরকম ভাবলেশহীন ভাবে তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। পৃথিবীর খবর, আশেপাশের খবর, রোদ ঝড় বৃষ্টির খবর কিছুই বোধহয় আজকাল আর তাঁর মাথায় পৌঁছচ্ছে না। আমার কথা তিনি একবারও জিজ্ঞেস করলেন না।

ঘরে কি ডেটল আছে? আমি জিজ্ঞেস করি।

মা আমার দিকে চেয়ে থাকেন। তখন একটা শাদা ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে আমি বাবার থ্যাঁতলানো আঙুলটা ভালো করে বেঁধে দিই। একটুখানি ফ্যাকাশে রক্ত আমার হাতে লেগে যায়। তাঁকে টেনে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে আমি নিজের নাম বলি। এবার সরাসরি ডাকনামটাই বলি এবং তিনি চিনতেও পারেন।

তবে তিনি শুধু বলেন, অ, কখন এসেছ? নীচের ঠোঁটটা সম্পূর্ণ ঝুলিয়ে দিয়ে ঝিমুতে শুরু করেন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। অসম্ভব ক্লান্ত লাগে। পাথরের দেয়াল কে ভাঙতে পারবে? আবার পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকি। কেউ নেই। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই– কোথাও কোনো শব্দ নেই। তেমনি নোংরা মেঘে আকাশ ঢেকে আছে।

রাতে আমি আর মা একঘরে শুয়েছি। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে বলে দরজা জানালা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে পুরনো নড়বড়ে একটা জানালা থেকে। হারিকেনটাও একটু আগে নিভে গেল। হাওয়ায় ছেঁড়া মেঘ নিশ্চয় অন্ধকার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশের ঘর থেকে বাবার কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। দুপুরে মা নিজের হাতে রান্না করে আমাকে খাইয়েছেন– অনেক জিনিশ বের করেছেন ভাঁড়ার থেকে যেগুলো তিনি শুধু আমার জন্যেই জুগিয়ে রেখেছিলেন। সেসব জিনিশের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তবু আধ-নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিশের অনেক যত তিনি শুধু আমার জন্যেই তৈরি করেছেন। আমার খেতে ভালো লাগেনি। যা তিনি রেঁধেছেন সবই কেমন আঁশটে, পুরনো মাটির গন্ধে ভরা।

না মা ঘুমোননি। এর মধ্যে তিনবার পাশ ফিরেছেন। তাঁর দীর্ঘশ্বাসের সেই ভীষণ শব্দ শুনেছি দু-বার। সন্ধেবেলায় যখন আলো ছিল, ঝোড়ো হাওয়াটাও ওঠেনি, সেইসময় মা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, জানতে চাইছিলেন, আমি এখন কী করি, কোথায় যাই, কাদের সঙ্গে কথা বলি, কি খেতে পছন্দ করি– এইসব। আমি উৎসাহের সঙ্গেই এসব কথার জবাব দেবার

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি, আমার একটি কথাও তাঁর কাছে পৌঁছচ্ছে না। তিনি খুবই অন্যমনস্ক বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপন মনে বলে উঠলেন, আমাদের সময়ে সে এক কাল ছিল।

আলো নিভিয়ে দেবার পর আমি কুঁজো হয়ে দুই হাত কোলের কাছে জড়ো করে শুয়ে পড়লাম। ছোটোবেলায় ঠিক যেভাবে মায়ের বুক ঘেঁষে শুয়ে শুয়ে রূপকথা শুনতাম, উৎসাহে টগবগ করে ফুটত আমার রক্ত, পঙ্খিরাজ ঘোড়ার ঘেমো গন্ধটা পর্যন্ত যেন এসে নাকে লাগত আর কত অসংখ্য রঙে ঝলমল করে উঠত আমার কল্পনা অন্ধকার রাতকে আলো করে দিয়ে– ঠিক সেইভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, মাকে বলি, একটা রূপকথা বলো। কতবার ভাবলাম বলি, এখন ঘুটঘুটে আঁধার, বোধহয় কিছু ঘটবে। কিন্তু জানি, কিছুই ঘটবে না– যে-নাড়িটা দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে বাঁধা ছিলাম, জন্মের পরের মুহূর্তেই কেউ তা কেটে ছিন্ন করে দিয়েছে। কোনো কিছুই আর ঘটবে না।

আমি ঝড়ের গর্জন শুনি– পুরনো শালকাঠের দরজায় আছড়ে পড়ছে। বুনো জানোয়ারের মতো ক্রমগত থাবা চালাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে, কিন্তু আমি জানি কিছুতেই ঘরে ঢুকতে পারবে না।

কাল সকালে উঠেই ফিরতি বাস ধরতে হবে। আমি হাত পা টান টান করে দিয়ে আঁধার ছাদের দিকে চেয়ে থাকি।

amarboi.com

যে ভিতরে আসে

প্রায় সন্ধেবেলা ট্রেন এসে পৌঁছুল। চেয়ে দেখি, ছোট্ট স্টেশন, লাল রং-করা ঢেউ তোলা টিনে তৈরি। একপাশে একটি টিকেট ঘর, অন্যপাশে যাত্রীদের জায়গা। স্টেশনের পুরো এরিয়াটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। একটু দূরেই খোয়া-ওঠা লাল রাস্তা, বাজারের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে স্টেশনের গা ঘেঁষেই গ্রাম শুরু হয়েছে। চোখ জুড়িয়ে যায় এমন ঘন সবুজ ঝোপ-জঙ্গল, বড়ো বড়ো গাছ, ঘন বাঁশের ঝাড়ে পুরোপুরি অন্ধকার। গাঁয়ের ওপর দিয়ে নীল ঢালু আকাশ, দিগন্তের একটু উপরে সূর্য, খানিকটা পরেই ডুবে যাবে। স্টেশনে লোকজন বিশেষ নেই, খালি জায়গাটায় পাকা মেঝের উপরে কাপড়ের পেটি নিয়ে একজন ধুলোমাখা লোক বসে আছে। স্টেশনমাস্টার গেটে এসে দাঁড়ালেন, ট্রেন থেকে আমারই মতন দু-চারজন নামলেন। আমার বগলে শতরঞ্চি-মোড়া ছোটো বিছানা, হাতে বেতের একটি সুটকেস। আমার সর্বস্ব ধন। ষোলো বছর বয়েস পর্যন্ত যা কিছু জোগাড় করতে পেরেছি প্রায় সবই সেখানে আছে। টিং টিং করে ঘণ্টা বাজল– ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সবুজ রঙের বরিশাল এক্সপ্রেস পাঁচ মাইল দূরে খুলনা শহরের দিকে চলে গেল।

সেই আমার প্রথম খুলনা আসা। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা লাভ। আমার বড়ো বোন তখন দৌলতপুর কলেজের ভিতরে থাকেন, স্বামী সেখানে ইংরেজি পড়ান। কতদিন আগেকার কথা। ইতিমধ্যে একুশ বছর কেটে গেছে। ভাবলেও মাথা ঝিমঝিম করে। ষোলো বছরের কিশোর– সর্ব অঙ্গে পাড়াগাঁর মোটা প্রলেপ, রাঢ়ের রোদে-পোড়া তামাটে রং, বয়েসের ভার নেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষার দেহখানা 'ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।' ষোলো বছরের ছেলের দেশান্তর, ধর্মান্তরের চেয়েও বেশি। দেশান্তরই বলি, কারণ দেশ ভাগ হয়ে গেছে ততদিনে, মুর্শিদাবাদ পাকিস্তান হবার কথা, আর খুলনা যাবে ভারতে। হতে হতে হয়নি। আমার পক্ষে অবশ্য বর্ধমানের এক পাড়াগাঁ থেকে খুলনা– এমনিতেই দেশান্তর।

কোথায় রাঢ়ের সেই বড়ো বড়ো ফুটিফাটা শুকনো মাঠ, ঘন বসতির সাজানো গ্রাম আর কোথায় খুলনার এই ভেজা সবুজ ধূলিহীন গাছপালা লতাপাতা পরিপূর্ণ প্রকৃতি। পনেরো বিশ মাইল না গেলে আমাদের অঞ্চলে নদী দেখা যায় না– আর এখানে দু পা গেলেই নদী নালা খাল। এই তফাত বর্ণনা করে বোঝাবার নয়। রাঢ়ের মানুষের চোখ যেন সবসময়ই রক্তবর্ণ, সূর্য সেখানে বদমেজাজি আর এখানে চোখের জন্যে কী অপরূপ দৃশ্য। এটা আমি টের পাচ্ছিলাম বেনাপোল পার হয়েই। পাসপোর্টের হ্যাঙ্গাম চুকে যাবার পর ট্রেন ছাড়লে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি চোখের জন্যে অফুরন্ত খাবার। রূপকথার বইয়ে আছে হিরের পাহাড়, সোনার পাহাড় কড়ির পাহাড়ের কথা– এখানে দেখি দু-পাশে সবুজের পাহাড়। এর মধ্যে বাড়ি ঘর চোখে পড়ে না। এক একটা স্টেশন আসে– অল্প দু-চারজন মানুষ নামে, জঙ্গলের সুঁড়িপথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর চারিদিক চুপচাপ নির্জন, শুধু পাখিদের গান বাতাসে ভেসে আসে।

একটু পরে একজন এসে টুং-টাং ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়, ট্রেন ছাড়ে। এমনি করে এল গদখালির মাঠ– ভয়ানক নিস্তব্ধ স্টেশন। দুপুর বেলায় একগাড়ি লোকজনের মধ্যে বসে আমার গা ছমছম করে উঠল। সেই যে গল্প : ম্যালেরিয়ায় গাঁয়ের সব মানুষ লোপাট হয়ে গেছে, কলকাতার জামাই তা জানে না, অনেক কাল বাদে এসেছে শ্বশুরবাড়ি– এসে দেখে গদখালি গাঁয়ে সব ঠিক আছে, গাঁয়ের লোকজন কাজকর্ম করছে, শ্বশুর দড়ি পাকাচ্ছে দাওয়ায় বসে, ঘোমটা মাথায় বউ এসে স্বামীকে পা ধোবার জলটল দিয়ে গেল। সবই ঠিকঠাক– তবে একটু যেন কেমন। সন্ধেবেলায় জানালা দিয়ে জামাই দেখে, রান্নাঘরে বউ রান্না করতে করতে উনুনের মধ্যে একটা পা ঢুকিয়ে দিল– দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। দেখেই তো কথা নেই, চোঁচা দৌড়। এই গল্প মনে পড়ল। হ্যাঁ, এরকম গল্পের উপযুক্ত জায়গা বটে। দেখেই মনে হয় এলাকাটা পরিত্যক্ত– কিন্তু সব সাজানো আছে– বাড়ি ঘর দুয়োর, সংসারের সব খুঁটিনাটি।

বেনাপোলের পরে ট্রেনের তলা থেকে একটা গুম গুম শব্দ আসে। রেলের সঙ্গে লোহার চাকা ঘসার এই শব্দ এসে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। এমন বিকট শব্দ আর কোথাও আমি শুনিনি।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই কলেজের গেট। লাল সুরকি ঢালা রাস্তা সোজা ভিতরে। গেট পেরিয়েই রাস্তা ছেড়ে বাঁ হাতে সরু পথ। ডানদিকে সবুজ

ঘাস ফুঁড়ে বড়ো একটা কাঁঠালি চাঁপার গাছ। লাল রঙের একটি হলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাকে তীব্র গন্ধ এসে লাগে। বিজ্ঞান বিভাগগুলির জন্যে গ্যাস সাপ্লাই করা হয় ইটের তৈরি ছোট্ট একটি ঘর থেকে। এখন লিখতে লিখতেই গন্ধটা যেন একবার পেলাম মনে হচ্ছে। সরু রাস্তাটা প্রায় একটা সুড়ঙ্গের মতো, দু-পাশে ঘন ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে বড়ো আমগাছ। রাস্তাটার শেষে কলেজের উত্তর-পশ্চিম টেরে আমাদের বাসা। ঠিক যেমনটি ভাবা যায়। গুটি দুই-তিন ছোটো ঘর, উঠোনের একপাশে বাঁশের বেড়ায় তৈরি স্নানের ঘর, শুকনো পাতা মাড়িয়ে উঠোনের আর এক কোণে গেলে বুক পর্যন্ত উঁচু নোনা ধরা দেশি পায়খানা।

বাইরের দিকে একটা ঘরে জায়গা হলো। কাঁচা মেঝে, টিনের চাল, বেড়ার দেয়াল। তাই তখন স্বর্গ আমাদের পক্ষে। বাড়িটার পিছনেই ভৈরব নদী। ঠিক এখানেই বেঁকে পুবমুখো হয়েছে। বাঁকটার এপারে লঞ্চ আর খেয়াঘাট। অসংখ্য ছোটো ছোটো নৌকো বাঁধা আছে। প্রথম রাতেই নদীর ঘাটের দিক থেকে এক বিরাট আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসি। স্টিমারের ভোঁ। লঞ্চ আর স্টিমারের কতো বিচিত্র আওয়াজই না শুনেছি। আমি কখনওই ভুলতে পারব না সেই সব শীতের রাতের কথা। খেয়ে দেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। গাছের পাতা থেকে একটানা টপটপ শব্দে টিনের চালের উপর শিশির পড়ছে, অন্ধকারে খরখর শব্দে বাতাস পাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পৈঠার উপর সামনের দু-পা তুলে আকাশের দিকে মুখ করে শিয়াল হেঁকে গেল, ঘুমন্ত বাড়িঘরের উপর দিয়ে কোনো স্টিমারের হেড লাইটের তীব্র আলো একটু সময় ঝলসে উঠে সরে গেল। তারপর ছলাৎ করে ভৈরবের জল এসে পাড়ে লাগে আর বিকট শব্দে ভোঁ বেজে ওঠে। পরে শান্তিনিকেতনের এক অধ্যাপকের স্ত্রীর কাছে জানতে পারি তিনি ওই একই বাসাতে তাঁর বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন। তাঁর হয়েছিল উলটো অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনের আশেপাশের কোনো ধানকলের ভোঁ শুনতে পেয়ে তিনি বিছানায় উঠে বসতেন। ভ্রম হত তিনি বুঝি জাহাজের বাঁশি শুনছেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে আঁধারে ডুবে থাকা মাঠ তাঁর কাছে মনে হত ভৈরব নদী। কান পেতে তিনি জলের শব্দও যেন শুনতে পেতেন। এই ভুল ভাঙতে তাঁর বহুদিন যায়। তবে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুল যেন আবার হচ্ছে।

দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজ বেশ পুরনো। ১৯০২ সালের। নাম ছিল

amarboi.com

দৌলতপুর হিন্দু অ্যাকাডেমি। আমি থাকার সময়েও বাইরে থেকে এই নামে চিঠিপত্র আসতে দেখেছি আর অকেজো বিরাট একটা ঘড়িঅলা যে আসল বাড়িটি এখনো আছে– যার উপরে তখন ছিল লাইব্রেরি, লাইব্রেরির দু-পাশে দু-ঘরে বসত ক্লাস– সেই বাড়িটির ঘড়ির নীচে হিন্দু অ্যাকাডেমি লেখা সিমেন্টের টুকরোটিকে ভেঙে ব্রজলাল মহাবিদ্যালয় লেখা হল তো সেদিন। কলেজ প্রথমে ছিল চতুষ্পাঠী– কলেজের সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন দধি-বামন দেবতা। দেবতার পক্ষে ট্রাস্টি কলেজ চালাত বলে শুনেছি। দধি-বামন গরিব ছিলেন না। কলেজের বিরাট ক্যাম্পাস। সমস্ত বাংলাদেশে রংপুর কারমাইকেল কলেজের ক্যাম্পাস সব থেকে বড়ো, তারপরেই দৌলতপুর কলেজ। ক্যাম্পাসের বাইরেও যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল কলেজের পাকা বাড়িঘর। এখন বারো ভূতে সে-সব দখল করে নিয়েছে– কিছু কলেজ কর্তৃপক্ষ বেঁচে বা বন্দোবস্তে দিয়েছেন। অবিভক্ত বাংলাদেশের নামকরা জমিদারদের দান এখনো পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। একটি বাড়ি মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দান। এখনো আছে।

কলেজের ইতিহাসের কথা থাক। তবে কিনা খুলনা বলতে আমি প্রথমে দৌলতপুর কলেজকেই বুঝি, তাই কলেজের কথা ছাড়া যাচ্ছে না। ওই ঘড়িঅলা অফিস-কাম-লাইব্রেরি বাড়িটির সামনেই চৌকো ঘাসে ঢাকা একটি চতুষ্কোণ মাঠ। মাঠটির চারপাশে একেবারে সোজা চারটি সুরকি ঢাকা পথ– সবুজ মাঠের লাল পাড়ের মতো। চার রাস্তারই দু-পাশে আম লিচু আর কিছু অপরিচিত বড়ো গাছ আগাগোড়া সবুজ তোরণের মতো রাস্তাগুলো ঢেকে দিয়েছে। এজন্যে কিন্তু জানি না, রাস্তার এক মাথায় দাঁড়ালে অফুরন্ত মনে হত গাছের সারি। মাঠের পুবদিকে ছেলেদের দোতলা হস্টেল, দক্ষিণদিকে টালির কটেজের মতো– এগুলোও হস্টেল– পশ্চিম দিকে অধ্যাপকদের একতলা শাদা বাড়ি, দুই ঘাট বাঁধানো টলটলে জলের বিশাল দীঘি, একদিকের ঘাটে মাধবীলতার কুঞ্জ, পুকুরের পশ্চিমে অধ্যক্ষের চমৎকার একতলা (এখন দোতলা) বাংলো, বিপরীত দিকে মাঠের পুব-দক্ষিণ কোণে আরো কিছু অধ্যাপকের বাড়ি, দুই ঘাট বাঁধানো একটি দীঘি, একেবারে দক্ষিণ-পূব কোণে আবার একটি পুকুর। এদিকে নদীর পাড়ে– উত্তর প্রান্তে বড়ো আঙিনাঅলা মন্দির। দুটি বড়ো বড়ো শাদা রংয়ের বাড়ি। মাঝখানের উঠোনে কাঠকরবী টগর গন্ধরাজ এইসব দিশি গাছের বাগান। ১৯৫৪ সালে কলেজ এইরকম। সব মিলিয়ে দৌলতপুর কলেজের নিভৃতি তুলনাহীন। কত রকমের পাখি

আসত তার নাম জানি না। সমস্ত কলেজ সবুজ, মাটি ভেজা, তার উপর কালো ঠান্ডা ছায়া। উত্তর দিকে ভৈরবের পাড়ে দুটি লাল রঙের পাকা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চের উপর বসে একদিন সূর্যাস্তের সময় যিনি উঁচু ভারি গলায় সাজাহান কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তিনি ছিলেন কলেজের নামকরা নট, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র, আমাদের সবার ঈর্ষার পাত্র। ছ-ফুটের উপর লম্বা, ফর্সা ধবধবে চেহারা। কিছুদিন আগে তাঁকে দেখেছি, চটকলে চাকরি করেন, চুলটুল উঠে এর মধ্যেই বুড়ো ফ্যাকাশে নির্জীব চেহারা।

দৌলতপুর কলেজে ছিল চিরবসন্ত। আমাদের জীবনেও তখন বসন্ত আসছে। উদ্দীপনা আশা ছাড়া মনের মধ্যে আর কোনো কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় না। চিরবসন্তের দৌলতপুরে বসন্তকাল আসত কাব্যবর্ণনার সঙ্গে পুরো মিল রেখে। ভ্রমর, মৌমাছি, কোকিল কিছুরই অভাব ছিল না। আকাশের রং যেমন হতে হয়, ফিকে নীল, গাছগুলোয় নতুন সবুজ পাতা, আম গাছগুলোয় এত বোল যে পাতা চোখে পড়ত না, নীচে দাঁড়ালে চটচটে মধুতে গা মাথা ভরে যেত। হয়তো এখনো তা যায়, লক্ষ করি না। যখন লক্ষ করতাম তখনকার কথা বলছি। কতদিন ছুটির দিনে বসন্তকালের দুপুর বেলায় একা একা ঘুরে বেড়াতাম। সমস্ত ক্যাম্পাস চুপচাপ। কোনো বাড়ির ভেতর হয়তো অধ্যাপকদের আড্ডা চলছে। ভাবতাম কী মহা জ্ঞানের কথাবার্তাই না হচ্ছে। আসলে হয়তো দলাদলির কথা হত।

বসন্তের মতোই শরৎ, জানান দিয়ে আসত। বাড়িতে এসেছিল একটি গ্রামোফোন। হেমন্তের গলায় এক শরতে প্রথম শুনি, শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়। উলটো পিঠে, হে ক্ষণিকের অতিথি। এই গান শোনার অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে মধুর মতো জমে আছে। আর পঙ্কজের চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে। গলা ডুবিয়ে সুরের মধ্যে চুবিয়ে গাইতেন, নিয়ো না নিয়ো না। শরতের পূর্ণিমায় একজন অধ্যাপকের বাড়ির ছাদে গানের আসর বসত। অনেক সমঝদার আসতেন, গাদা গাদা পান খাওয়া চলত। খেয়াল ঠুংরি ভজন রবীন্দ্রসংগীত নজরুলগীতি সেতার এসরাজ চলত অনেক রাত পর্যন্ত। এইখানেই প্রথম আজকের নামকরা সংগীতজ্ঞ সাধন সরকারকে দেখি। আসরের শেষে সন্দেশ খাওয়া হত।

অধ্যাপকদের কথা বলি। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ফজলুর রহমান। অসামান্য প্রতিভাধর মানষ। সেইজন্যেই পরে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। কয়েক বছর আগে লন্ডনে হৃদরোগে মারা যান। কী চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছিল তাঁর–

চোখে পুরু কাচের চশমা– চশমা খুলে নিলেই প্রায় অন্ধ, অক্সফোর্ডের উচ্চারণে অপূর্ব ইংরেজি বলতেন। তিনি যে আমাদের ডিকেন্সের পিকউইক পেপার্সের একটি অংশ পড়াতেন আর ইয়েট্সের গীতাঞ্জলির ভূমিকা তা কি কোনোদিন ভোলা যাবে? পানের রসে রাঙা পাতলা ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে পিকউইক ক্লাবের সদস্যদের পাখি শিকার কাহিনির বর্ণনা আমার কাছে তো অবিস্মরণীয়। খুবই আধুনিক ছিলেন তিনি– সেটা বোধহয় সকলের ভালো লাগত না। ভোর বেলায় একহাতে শৌখিন ছড়ি নিয়ে, অন্য হাত বিদুষী স্ত্রীর কাঁধে রেখে বেড়াতে বেরোনো অনেকের কাছেই তেমন রুচিকর ছিল না। কখনও কখনও আমাদের ঘরের ভিতরে এসে ঠুক ঠুক করে ছড়ি দিয়ে আমায় কপালে মেরে ইংরেজি বলা জিভে সামান্য বিকৃত উচ্চারণে বলতেন, ওঠ ওঠ। ফজলুর রহমানের মতো নানা বিষয়ে পণ্ডিত তীক্ষ্ণধী মানুষ আমাদের দেশে গন্ডায় গন্ডায় মেলে না।

আর ছিলেন সর্বজন পরিচিত সম্বুদ্ধ। আসল নাম অমূল্যধন দাশগুপ্ত, আমাদের রুটিনে এ ডি জি। শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীর হাস্যরসের লেখক। বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ, তাঁর পাঞ্জাবির হাতা ছিল আঙুলের ডগা পর্যন্ত। এমন বলিয়ে-কইয়ে মানুষ কম দেখেছি, মুখের ভাষা ছিল শাণিত ঝকঝকে তীব্র দ্রুত ও অনর্গল। প্রায় সব বিষয়েই অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁকে কোনোদিন কারো কাছে অপ্রস্তুত বা অপ্রতিভ হতে দেখিনি, যে-কোনো প্রশ্নের জবাব জিভের ডগায় তৈরি। বিশেষ করে যদি কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি হত তখন বিদ্যুতের মতো চমক দিত তাঁর কথা– শ্লেষ, ব্যঙ্গ আর মর্মভেদী রসিকতা ঠিকরে পড়ত। কাউকে সামনে পেলে কথা চালাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার হস্টেলের দুটি ছেলে খেতে খেতে তর্ক শুরু করেছিল হাঁসের ডিম না মুরগির ডিম কোনটা বেশি পুষ্টিকর এই নিয়ে। তারা সম্বুদ্ধের কাছে যায় এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে। তিনি তখন খেতে বসেছিলেন– খাওয়া শেষ করে এসে বসলেন, ওদের প্রশ্নটা শুধু শুনলেন একবার। তারপর দ্বিজ অণ্ডজ ব্রাহ্মণ বর্ণপ্রথা পক্ষীজাতি এইসব প্রসঙ্গ। পাঁচটার সময় ওদের দুই বন্ধু উঁকি মেরে দেখে আসে, সম্বুদ্ধ কথা বলছেন, ছেলে দুটি প্রায় মূর্ছা যাবে। ছ-টার সময় তিনি ওদের এই কথা বলে ছেড়ে দেন, হাঁসের ডিম আর মুরগির ডিম– তফাত উনিশ বিশ– বা ভাগ্ ছোঁড়া। হ্যাঁ, এইভাবেই কথা বলতেন তিনি। ছাত্রদের হস্টেলের সিঁড়ির নীচে একদিন সকালে একটি বিরাট গোখরো সাপ দেখা গেল। ছেলেরা তো চেঁচাতে চেঁচাতে হস্টেল ছাড়ছে আর সাপও

ঘাবড়ে গিয়ে ঢুকেছে একটা গর্তে। কোথায় ছিলেন সম্বুদ্ধ, বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে অপসৃয়মান গোখরোর লেজ চেপে ধরলেন। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, সাপ যাবে গর্তের মধ্যে, তিনি তাকে টেনে আনবেন বাইরে। সম্বুদ্ধের গলায় জাহাজের কুলির মতো হেঁইয়ো হো আওয়াজ। বুকের আঁশগুলো খুলে গর্তের ভিতরে সাপ আঁকড়ে আছে– শেষে নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে সম্বুদ্ধের হাতে অর্ধেকটা গোখরো এসে গেল। এই ঘটনার আধঘণ্টা পরে স্নান-টান করে সম্বুদ্ধ ক্লাসে আসেন ; ছেলেরা প্রশ্ন করে, স্যার, যদি কামড়াত। সম্বুদ্ধ বলেন, কামড়াত তো কী হত? দুম করে মরে যেতাম! অবিকল। এমনি করেই বছর কয়েক আগে সম্বুদ্ধ পশ্চিমবাংলায় এক হাসপাতালে দুম করে মরে গেছেন। গেরুয়া রঙের সেলাইহীন লুঙি পরে খালি গায়ে থলে হাতে তিনি বেগে বাজারে যাচ্ছেন– এই ছবিটা আমি এখনো দেখতে পাই। আর সেই দৃশ্যটা– গাড়ির ধাক্কা লেগে এক বুড়ো চাষির মাথা থেকে বেগুন মূলো ছড়িয়ে পড়ল, তীব্র গতিতে ছুটে সম্বুদ্ধ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বুড়োকে কোলে নিয়ে বসলেন, ট্যাঁক খুলে বাজারের সব পয়সা বের করে বুড়োর মুঠোয় গুঁজে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পয়সা তিনি ট্যাঁকে রাখতেন।

বাঙালি পাঠক সম্বুদ্ধকে ভুলে গেছে। নিজেকে তিনি বলতেন পরশুরামের শিষ্য– তাঁর একটি বইয়ের শুরুতে এক কবিতায় জানালার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর ঠিকানা টুকে নেওয়ার কথা আছে, পরশুরামকে উৎসর্গীত কবিতা। হয়তো তাঁর শিকারকাহিনি বইয়ের কান্তিবাবুর গল্পগুলো এখনো আমাদের খারাপ লাগবে না– সেই জিলেট ব্লেড দিয়ে আলিঙ্গনরত ভালুকের বুকের পুরো লোম কামিয়ে দিয়ে তারপর ভোজালি চালানো বা চাটগাঁর মাঝির উনি (শুটকি) রান্না করা হাতের থাবড়া খেয়ে 'সাপটি বমি করিতে করিতে মরিয়া গেল।' অসম্ভব অবাস্তব সব গল্প। এরকম গল্প এখন আর লেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্বুদ্ধ রক্ষণশীল ছিলেন, বহু বিষয়ে সংকীর্ণও, তবু একদিন সন্ধেবেলায় তিনি যখন নিচু শান্ত গলায় আমকে বলেন, জানো আমার লেখা শেষ, আর আমার লেখা হবে না– তখন আমি বুঝতে পারি সম্বুদ্ধ পুরোপুরি সাধারণ মানুষও ছিলেন।

দৌলতপুর কলেজের আরো অনেক অধ্যাপকের কথা মনে পড়ে। অর্থনীতির বিমল ঘোষ, বাংলার নীলরতন সেন, নীল সেন নামে সই করতেন। ছিলেন মজার মানুষ বাণিজ্য বিভাগের হক সাহেব, ইংরেজির মোয়াজ্জেম হোসেন, লজিকের মোসলেম হুদা। ভীতিকর পাণ্ডিত্য ছিল দর্শনের অমূল্যধন

amarboi.com

সিংহের। আর ছিলেন গণিতের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মজুমদার। ভারতীয় সংগীতে তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম– নিজেও প্রায় সব যন্ত্রেরই নিপুণ শিল্পী। ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন আইন– হেন শাস্ত্র নেই যা তাঁর আয়ত্তে ছিল না। এইসব মানুষের কতক মারা গেছেন, কতক দেশত্যাগ করেছেন, অন্যেরা নানা ঠিকানায় ছড়িয়ে পড়েছেন।

সেই ১৯৫৪-৫৫ সালে দৌলতপুরের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মাইল দূরের খুলনা শহরের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। অবশ্য কলেজের বেশির ভাগ ছাত্রই আসত খুলনা শহর থেকে। একটি ছোট্ট ট্রেন দিনে বারতিনেক দৌলতপুর-খুলনা যাতায়াত করত। দূরগামী নিয়মিত ট্রেনও কয়েকটি ছিল। একটি মাত্র পাকা রাস্তা। রাস্তাটি অবশ্য ভালোই এবং আজও আছে– যশোর রোড। খুলনা থেকে কলকাতা যাওয়া চলে এই রাস্তা দিয়ে। তবে এই রাস্তা ধরে খুলনা যাতায়াত আমাদের জন্যে মোটেই সুবিধেজনক ছিল না। অতি পুরনো লক্কর মার্কা দু-একটি বাস অবশ্য ছিল, কিন্তু সেগুলির যাতায়াতের বাঁধা সময় কিছু ছিল না। এই বাসে খুলনা যেতে গিয়ে কত রকমের বিপত্তিই না হত ভাবা যায় না। পায়ের তলা থেকে তক্তা খুলে রাস্তায় পড়ে যেত। ইঞ্জিন বন্ধ করে তক্তা কুড়িয়ে এনে আবার খাপে খাপে ফিট করে দেখা গেল ইঞ্জিন আর চালু হয় না। হ্যান্ডেল ঘোরাতে ঘোরাতে ড্রাইভারের সঙ্গের লোকটির দম ফুরিয়ে আসে, গাড়ি আর চলে না। তবে এই রাস্তায় সাইকেলে আমি খুব যাতায়াত করেছি। কাঁচা গল্প লিখে নতুন পরিচিত সাহিত্যরসিক বন্ধুকে শোনাতে গেছি। যশোর রোড দিয়ে সাইকেলে চলাচলের অভিজ্ঞতা আমি কোনো দিন ভুলব না। আঁকাবাঁকা পিচঢালা তকতকে প্যাঁচানো রাস্তা, দু-পাশে প্রায় গহন অরণ্য। বাড়িঘর তো দূরের কথা, মাথার উপরে আকাশ পর্যন্ত দেখা যেত না। বুনো শুয়োর থেকে ঠ্যাঙাড়ে কোনো ভয়েরই কমতি ছিল না। কাশীপুর, গোয়ালখালি, খালিশপুরের ভিতর দিয়ে জোড়া গেট পেরিয়ে মূল খুলনা শহর। কিন্তু জোড়া গেটের পরেও মাইল দুয়েক পার হতে সন্ধের দিকে গা ছমছম করত। একটি দুটি মানুষ, টিমটিম করে জ্বলছে হারিকেনের আলো। ডাকবাংলার মোড় পর্যন্ত না পৌঁছুলে স্বস্তি নেই।

আজকের খুলনা শহর আর উপশহর দেখলে একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। মানুষ আর যন্ত্রের হাত এমনিই বদলে দিয়েছে এলাকাটা। এখন খালিশপুরে বিরাট শহর গড়ে উঠেছে– ঢাকার ধানমণ্ডির মতোই প্রায়, আলোয় ঝলমলে শহর। অথচ বলা যায় গহন অরণ্য কেটে, মাটি ভেঙে

ভরাট করে, গরিব মানুষদের হটিয়ে, জীব জানোয়ার খেদিয়ে মাত্র বিশ বছরের মধ্যে এই আলাদীনের ব্যাপার সম্ভব করে তোলা হয়েছে। তখন একটিও চটকল ছিল না– এখন দৌলতপুর এলাকা তো দূরের কথা– আরো ৮/১০ মাইল যশোরের দিকে উজিয়ে সেই ফুলতলা পর্যন্ত অসংখ্য চটকল বসেছে। ভৈরবের স্রোত তখনো একটু আধটু ছিল– এখন নদী হাঁসফাঁস করছে ; ওপাড়েও তো কলকারখানা ইত্যাদি হয়েছে। বনজঙ্গল পরের কথা– বড়ো বড়ো গাছগুলোও নিশ্চিহ্ন– বিরাট এলাকা ঠিক ভাগাড়ের তো পড়ে আছে। নগরায়ন ভালো কথা ; ফুটো হারিকেনের আলো, কাঁচা ভরভরে কাদায় ভর্তি রাস্তাঘাট, রোগজীবাণুর ডিপো ডোবা মশামাছি– এই সবে টিকিয়ে রাখার প্রস্তাব যে দেয় প্রকৃতির ভারসাম্য রাখার খাতিরে, তিনি একজনে ন্যাকা কবি। কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য রাখার কথাটা মিথ্যা নয় এবং সুপরিকল্পিত শিল্পায়নের প্রসঙ্গও তো আর কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তখনকার পাকিস্তানের উঠতি বড়োলোকদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান ছিল না– হাভাতের মতো যা পায় দু-হাতে পেটে পোরে। এদের জন্যে সরকারকেও পুঁজিপতি বনে যেতে হয়। সরকারের সাহায্য নিয়ে বড়োলোকেরা কাঁচা টাকা ছড়িয়ে, লোকজন উৎখাত করে পুরো এলাকাটা দশ বছরের মধ্যে লন্ডভন্ড করে ফেলল। জীবনের একটা কাঠামো তারা ভেঙে দিল– নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে পারল না। একদিকে খানিকটা জায়গা সাফ-সোফ করে বিলেত আমেরিকার মতো অতি আধুনিক জীবনের সব উপকরণ জোগাড় হয়ে গেল– অন্য দিকে ঠিক তার পাশেই, কল-কারখানার প্রয়োজনে গাঁ থেকে চাষি মজুর এনে বিরাট বিরাট বস্তি তৈরি করা হল। খুলনার এমন যে স্নিগ্ধ প্রকৃতি তা তছনছ হয়ে ন্যাড়া খোলা কদর্য ও কিম্ভূত একটা এলাকা দেখা দিল। ন্যাংটো, বিকৃত, ক্ষুধার্ত মানুষের দল হায়েনার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই ব্যাপার আমি চোখের উপর ঘটতে দেখেছি। এখন খালিশপুরে দাগড়া দাগড়া ঘায়ের মতো বস্তি– চার পাশ থেকে এলোমেলো শ্রীহীন বাড়ি-ঘর দালান কোঠা উঠে দৌলতপুর কলেজকে প্রায় পিষে ফেলেছে। কলেজের পুবে দক্ষিণে বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানোর মতো তেলের ডিপো– কলেজকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। ভয়াবহ ব্যাপার। যশোর রোড়ের পাশাপাশি নাক বরাবর সোজা আর একটি রাস্তা তৈরি হয়েছে। দৌলতপুর থেকে খুলনা পর্যন্ত। পাঁচ মিনিট পর পর বিরাট বিরাট বাস যায়, মিনিটে মিনিটে বেবি ট্যাক্সি চলছে। ট্যাক্সিও আছে দশ মিনিটে এখন দৌলতপুর থেকে খুলনা যাওয়া চলে। ট্রেনে আর কেউ চাপেই না।

পরিবর্তনের কথা তুললে বলব কল্পনাতীত পরিবর্তন। নতুন সমাজ, নতুন সংস্কৃতি, নতুন মানুষ। তবু ১৯৫৪ সালের মানুষ আজ যদি দৌলতপুর থেকেই খুলনা শহর দেখতে পায়, তার কাছে মনে হবেই যে সব শূন্য ফাঁকা মরুভূমি– নির্বিচারে লোভ চটচটে হাত বাড়িয়ে সমস্ত সাবাড় করেছে। পুঁজির দাপটে সাবেক মানুষদের ঘরবাড়ি গেছে, উঠেছে ছাপরা, জনবসতিহীন এলাকায় এখন পিলপিল করে যে মানুষরা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তাদের মানুষ বলা দুষ্কর। ভয়াবহ রূপান্তর। সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিবিধি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁরা বলবেন আমাদের দেশে এই রূপান্তর এড়ানোর পথ ছিল না। তবে এটাও বলা চলে যে মানুষের যে ধীর ও নিশ্চিত দুর্গতি চোখের আড়ালে ছিল বহুতর মাত্রা নিয়ে সেই একই দুর্গতি একেবারে চোখের সামনে এসে পড়ল আর আগের তুলনায় তাতে জড়িয়ে পড়ল আরো অনেক বেশি মানুষ। এই দুর্গতি এতই নগ্ন যে এতে কোথাও এতটুকু সান্ত্বনা নেই। এই জন্যেই একটু কবিত্ব ফলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ১৯৫৪ সালের খুলনা কর্পূরের মতো উবে গেল– ঘাস থেকে যেমন শিশির শুকিয়ে যায়। রূপে ভরা একখণ্ড পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে গেল, যার কোথায় যেন কেমন একটা অবুঝ রহস্য আর মোহ ছিল, অন্ধকার-মেশা ভয়ের মতো। এখন দুপুরের খাড়া রোদে কে কী কোনদিকে ভেগে গেল। এজন্যে মায়া নেই– তবে মায়া ছিল তা ভুলতে চাই না। ১৯৬৪ সালে আমি নিজেই আমার এত সাধের দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপক হয়ে আসি। ছিলামও সেখানে নয় বছর। সে কথা আপাতত কিছুই বলছি না। সত্য অতি চমৎকার জিনিস– তবে সব সময় তা বলতে ভালো লাগে না।

১৯৬১ সালে পাকাপাকি বসবাসের জন্যে খুলনা চলে আসি। ততদিনে যশোর থেকে খুলনা পর্যন্ত যশোর রোডের যে হাড়গোড় বের করে অংশ চলাচলের অযোগ্য ছিল, সেটা কংক্রিটের সুন্দর পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। নিয়মিত বাস সার্ভিস চালু হয়েছে– যশোর থেকে একটা, ফুলতলা থেকে একটা। যে জায়গাটায় আমরা থাকতে শুরু করি, তার নামটি সুন্দর, ফুলতলা, খুলনা শহর থেকে তার দূরত্ব চোদ্দো মাইলের মতো। এখান থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে খুলনা পৌঁছুতে অসুবিধে নেই। ১৯৫৪ সালে এটা ভাবাও যেত না। পথটা শুধু দুর্গমই ছিল না, দুর্ভেদ্যও ছিল। বহু জায়গায় জঙ্গল ঝোপ এসে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ঝোপজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে খাসা রাস্তা তৈরি হল– পুরো এলাকাটা হয়ে গেল বৃহত্তর খুলনা। চটকলগুলোও

আস্তে আস্তে জায়গা দখল করে এগিয়ে আসতে লাগল। কয়েক বছর বাইরে থেকে এখন খুলনা দেখে আমি তো অবাক। যে একমাত্র সড়কটা খুলনা শহরের ডাকবাংলোয় গিয়ে মিশেছে– যে জায়গাটিকে বলা যায় খুলনার প্রবেশদ্বার– সেই সড়ক আর সেই সঙ্গমস্থল আমূল বদলেছে। বোঝা গেল ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে খুলনা শহরের উপকণ্ঠ নয় শুধু, পুরনো খুলনা শহরটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খুলনা এখন শহর নয়, নগর। সেই যে পুরনো শহর খুলনা– যার একটিমাত্র প্রধান রাস্তা, নগরপিতা বড়ো ভালোবেসে প্রত্যেক দিন ভোরবেলায় যে রাস্তাটিকে ধোয়াতেন আর এই স্নাত, ধুলোহীন, গাছপালায় সবুজ খুলনার রূপে মুগ্ধ আমার এক আত্মীয় যে বলেছিলেন, খুলনার রাস্তায় ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে গড়াগড়ি দিলেও পোশাকে ময়লা ধরে না– সেই সুরূপা ছোট্ট শহর খুলনার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আর তা হলে যা হয়, আমরা সবাই তা জানি এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম সকলের ভাগ্যেই তা ঘটেছে। নগরায়নের নামে দক্ষযজ্ঞ কারবার। এই স্ফীত জোর করে ঢোকানোর জন্যে নগরের মধ্যে গ্রাম ঢুকে গেছে ; বিজলি বাতির তলায় চকচকে মানুষদের মনে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ অন্ধকার ও কুটিল সংস্কার সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে।

যাক গে, যেখানটার আমরা বাস করতে শুরু করি– ষাটের দশকের প্রথমেও সে জায়গাটা পুরোপুরি গ্রামই ছিল। লোকবসতি পাতলা, দশ বিঘে পনেরো বিঘে জমি এক একটি বাড়ি– নারকেল সুপারি আম জাম কাঁঠাল লিচু আর বুনোগাছের জঙ্গলে সহজে কোনো বাড়ি চোখে পড়তেই চায় না। কোথাও ধুলো নেই, মাটি ভেজা ঠান্ডা, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু সরু আঁকাবাঁকা সুঁড়িপথ। গ্রামটা পেরিয়ে গেলেই বিশাল বিল। চোখ কোথাও আটকায় না। সন্ধেবেলায় নিজের বাড়িতে বসে মনে হত সভ্যতা থেকে বহুদূরে অরণ্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি। জায়গাটার প্রেমে পড়ে যাই। আস্তে আস্তে মানুষজন নজরে পড়তে থাকে। ভূমিহীন খেতমজুর, অভাবে মানুষের সবগুলি গুণ খুইয়ে বসে আছে। কাছে আসে জেলে, কুমোর, তাঁতি, হৃতসর্বস্ব মদ্যপ, চরিত্রহীন জমিদার, জমির দালাল, নানা ধান্দার ধোঁকাবাজ টাউট, প্রভাবশালী প্যাঁচালো দোকানদার, ব্রিটিশ আমলের নির্যাতিত আদর্শবাদী পঙ্গু রাজনৈতিক কর্মী, স্কুলমাস্টার। বিচিত্র মানুষের দল– সকাল বেলায় এদের রেখে চলে আসি খুলনা শহরে। সারাদিনই প্রায় কাটাই– বিকেলের দিকে বাসে চেপে আবার ফিরে যাই।

amarboi.com

খুলনার কথা যখনই ভাবি, মনে পড়ে পুরো এক দশকেরও বেশি কী তীব্র খরস্রোতের মধ্যেই না জীবন কাটিয়েছি। একদিকে গ্রাম ও গঞ্জের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে জীবনে, অন্যদিকে খুলনা শহরের সঙ্গে আমার বাঁধন পড়ছে একটার পর একটা। শহর থেকে গাঁয়ে ফিরলেই গাঁয়ের মানুষ। প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুলের ব্যাপারে মাথা দিতে হয়। গাঁয়ের রাস্তায় মাটি না পড়লে সরকারের শ্রাদ্ধ করি, স্কুলমাস্টার বন্ধুর বিয়েতে দশ-গাঁ ঠেঙিয়ে বরযাত্রী যাই। মাঝখান থেকে লাভ হয় এই, খুলনা দিনে দিনে চোখের সামনে খুলে মেলে বিছিয়ে যেতে থাকে– মানুষের নানা রকম পেশা চোখে পড়ে, জীবনের কাঠামো গড়ে ওঠে কোন উপাদানে পরিষ্কার বোঝা যায়– মানুষের জীবনধারার স্পর্শ পাওয়া যায়। যেমন ঠগ জোচ্চোর বদমাশ দেখতে পাই, তেমনি দেখি সন্তের মতো মানুষ মিশে আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, হাইস্কুলের নির্বাচন নিয়ে কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াই তা শুধু আমিই জানি। খেয়াঘাট পার হই– জেলেপাড়ায় সময় কাটাই, দূরের কোনো গাঁয়ে মরণাপন্ন রুগির শিয়রে বসে দেশের কল্যাণ সম্পর্কে কথা শুনতে পাই। ছেলেদের যাত্রা থিয়েটারে উৎসাহিত করি, হাটের লোকদের কাছে সংস্কৃতি সংঘের চাঁদা আদায় করা হবে কিনা তা নিয়ে পর্যন্ত তর্ক হয়। এই সব ব্যাপার।

একই সঙ্গে খুলনা শহরে চাকরি করতে গিয়ে পরিচিত লোকজন পাওয়া যায় কিনা খোঁজাখুজি শুরু করি। ছাত্রবস্থায় যারা বন্ধু ছিল, তাদের কারুর সন্ধান পাই না– কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে জীবনের টানে। এই সময়, ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে হবে, এক বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই– নাজিম মাহমুদ। রাজশাহীতে আলাপ, ঘনিষ্ঠ হবার আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি আজম খান কমার্স কলেজে ইংরেজি পড়ান। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সঙ্গে ছিলেন তাঁরই একজন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান। নতুন জায়গায় গেলেই আস্তে আস্তে বন্ধুবান্ধব জুটে যায়। যিনি বন্ধু পান তাঁর জন্যে সেটা খুব মূল্যবান হলেও আসলে ব্যাপারটা মামুলি এবং তার বিশদ ব্যাখ্যান অন্যের জন্যে বিরক্তিকর। তবু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের একটু বিশদ বর্ণনা দিতে হচ্ছে এইজন্যে যে এই যোগাযোগের ফলেই জন্ম নিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা পরের ছয়-সাত বছর ধরে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে খুবই বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়।

নাজিম মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান এবং তাঁদের সঙ্গে আর একজন ছাত্র

জহরলাল রায় একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আমার সহযোগিতা চান। নাজিম মাহমুদ গোষ্ঠীর নাম ঠিক করেন সন্দীপন। মনে পড়ে যশোর রোডের উপরে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মুখোমুখি একটি ঢাউস পুরনো ভুতুড়ে বাড়ির তেতলায় সন্দীপনের দ্বিতীয় আসরে আমি প্রথম যাই। যে দুটি ছোটো কুঠুরিতে মুস্তাফিজুর রহমান থাকতেন তার একটিতে আসর বসেছিল। দ্বিতীয় কি তৃতীয় আসরে নাজিম মাহমুদ সন্দীপনের জন্যে একটি সম্প্রদায়সংগীত রচনা করেন এবং তারপর যা যা প্রয়োজন– যেমন সংবিধান রচনা, পরিচালনা পর্ষৎ করা ইত্যাদি যথানিয়মে হয়ে যায়। যে সংগীতশিল্পীর কথা আগে উল্লেখ করেছি সেই সাধন সরকার এসে যোগ দেন। যতদূর মনে পড়ে, সন্দীপনের একেবারে শুরু থেকেই কবি আবুবকর সিদ্দিক আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি তখন বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা করতেন। খুলনা থেকে বাগেরহাটের বাইশ মাইল দূরত্ব আর সেই জাদুঘরের মিটার গেজের ট্রেন, সাইকেল আরোহীও পাঁই পাঁই করে যা ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে– সেই ট্রেন আবুবকর সিদ্দিকের উৎসাহে একটুও চিড় ধরাতে পারেনি। সন্দীপনের প্রায় সব আসরেই তিনি আসতেন। গণসংগীত রচনার দায়িত্ব প্রধানত নাজিম মাহমুদ এবং আবুবকর সিদ্দিক ভাগ করে নিয়েছিলেন। মনোয়ার আলী এবং অন্যান্য কয়েকজনও চমৎকার গান লিখেছিলেন কয়েকটি। নাজিম মাহমুদ তাঁর লেখা গানগুলি নিয়ে 'চেতনার সৈকতে' নামে একটি স্বরলিপি সংকলন করেছেন। আবুবকর সিদ্দিকের বেশ কিছু গান শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই মেটায়নি, পরবর্তীকালে গোটা দেশে ছড়িয়েছে। এঁদের প্রায় সবগুলি গানেই সুরারোপ করেছিলেন সাধন সরকার।

আমার আরো এক বন্ধু খালেদ রশীদ– যিনি খুলনা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্যে মাত্র কিছুদিন আগেই এসেছিলেন, সন্দীপনে এলেন। প্রথম সভাপতি হলেন নাজিম মাহমুদের পিতা আবদুল হাকিম। এই হৃদয়বান সুপণ্ডিত নিরহংকার মানুষটি এখন আর বেঁচে নেই। তিনি বটগাছের মতো সন্দীপনকে দিয়েছিলেন ছায়া আশ্রয় ও শান্তি। বেঁচে নেই খালেদ রশীদও যিনি খুলনায় এসেছিলেন একজন অপরিচিত অধ্যাপক হিশেবে আর ধীরে ধীরে ৬/৭ বছরে আমাদের চোখের উপরেই বেড়ে উঠেছিলেন অসাধারণ বড়ো মানুষ হয়ে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না, তাঁর কলেজ, সন্দীপন, খুলনা শহর আর তাঁর জন্যে যথেষ্ট নয়, তাঁকে জায়গা দিতে পুরো দেশ লেগে যায় বা অন্যভাবে বলা যায় তিনি নিজেকে পুরো

দেশের যোগ্য করে তুললেন। খালেদ রশীদ আমাদের বন্ধু ছিলেন একথা এখন বলতে থমকে যাই, সেই সৌভাগ্যে বিশ্বাস হয় না– অথচ আশ্চর্য, তিনি তাই ছিলেন এবং আমাদের অনেকের কাছে একমাত্র তাই-ই ছিলেন যেমন খুলনার তাবৎ শিশুরা ছিল তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে একটু পরোয়া না করে নির্ভয়ে কাঁধে মাথায় বুকে চড়ে বসত বা বাড়ির মেয়েরা যাঁরা তাঁকে বড়োভাই বা পুত্র জ্ঞান করতেন। খাঁটি ইস্পাতে তৈরি এই মানুষটি সন্দীপনে এসেছিলেন প্রায় অলক্ষিতে। এমনকী আমিও– প্রথমদিকে তাঁর একমাত্র পরিচিত মানুষ ছিলাম আমি– তাঁকে লক্ষ করিনি। তিনি যোগ দেওয়ায় সন্দীপনের আসর সরগরম হয়ে ওঠেনি– তিনি গান গাইতে, বক্তৃতা দিতে, কবিতা গল্প সমালোচনা লিখতে পারতেন না। মিষ্টি মৃদু হাসি আর শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষুরধার দু-একটা মন্তব্য ছাড়া আসরকে তিনি আর কিছু উপহার দিতে পারতেন না বলেই একটা ধারণা হত। কিন্তু সন্দীপন পরে যে বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করে তার অনেকটাই তাঁর কাজ। এ কথা কখনো বিনা দ্বিধায় বলা চলে, সন্দীপন যে কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিবিলাসী শহুরে শিক্ষিত মানুষের অবসর বিনোদনের প্রতিষ্ঠান না হয়ে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা নিতে পেরেছিল, এটা প্রধানত খালেদ রশীদের জন্যে ঘটেছিল। সন্দীপনের নাজিম মাহমুদের অসাধারণ সংগঠনশক্তি, প্রশস্ত বুকে মানুষকে টানার তাঁর দুর্জয় ক্ষমতা, প্রবল প্রতিভার অধিকারী শিল্পী সাধন সরকারের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে, মুস্তাফিজুর রহমান, মনোয়ার আলী, আবুবকর সিদ্দিক, বিদ্যুৎ সরকার, প্রধীশরঞ্জন বিশ্বাস, মোমিনুল ইসলাম, আইনুল ইসলাম, জাহিদ হোসেন, জাহানারা বেগম, গৌর ঘোষ এবং আরো অনেক অক্লান্তকর্মী তরুণ ও সেই সঙ্গে সন্দীপনের সাথে সরাসরি জড়িত আরো অনেক সংখ্যাহীন তরুণ তরুণী সন্দীপনে কাজ করে যে গৌরব অর্জন করেছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র হানি না ঘটিয়েই বলতে পারি, খালেদ রশীদই সন্দীপনের মূল ব্যক্তিত্ব। সন্দীপনের শেষ পর্যায়ে খালেদ রশীদ বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, সমস্ত প্রকাশ্য সংগঠন বর্জন করেন এবং মধ্যবিত্তের জীবনে লাথি মেরে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যান। একাত্তর সালের মাঝামাঝি অস্ত্র হাতে লড়তে লড়তেই পাকিস্তানি পশুদের হাতে তাঁর জীবন যায়।

একটা ধোঁয়াটে মানবহিতৈষণার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সন্দীপন কাজ শুরু করেছিল। শুধু এইটুকু জেনেই প্রতিষ্ঠানটি সরকারের বিষ নজরে পড়েছিল

এবং সন্দীপনভুক্ত প্রায় সব সদস্যকেই এজন্যে কঠোর নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। অবাক লাগে ভাবতে যে, কর্মহীন প্রয়োগহীন বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির চর্চাকেই মারাত্মক বলে ঠাউরেছিলেন আমাদের যে প্রাক্তন শাসকরা তাঁরা কতটা অন্ধই না ছিলেন। পট পরিবর্তন হতে থাকে ছেষট্টি সালের পর থেকে। শুধু মানবতার জয়গান, শিক্ষিত মানুষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নির্দোষ বুদ্ধি ও আবেগের পরিচর্যা, গোটা দেশে আগুনের মতো ছড়িয়ে-পড়া আন্দোলনের প্রতি তুলনায় পানসে লাগতে থাকে। সবারই হয়তো মনে আছে, ঊনসত্তরে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখার সুযোগ পায়নি। নিরপেক্ষতার মজা দেশ থেকে উবে গিয়েছিল এই সময়টার। ভাবতে আনন্দ পাই যে সন্দীপন হাজার রকম পিছুটান নিয়েও ক্রমাগত বেড়ে উঠেছিল, দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখেনি।

সন্দীপনের ইতিহাস আমি লিখতে বসিনি– যদিও লেখা উচিত বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক অন্দোলনের ইতিহাস যিনি লিখবেন এ-কাজ তাঁরই। আমি প্রসঙ্গটা তুলেছি। কারণ, ষাটের দশকে আমি যা কিছু করেছি– ব্যক্তিগত বা সামাজিক পর্যায়ে, নিজে আনন্দ পাবার জন্যে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বাইরে কাজের জন্যে তার প্রায় সবটাই সন্দীপনকে কেন্দ্র করেই করেছি। প্রসঙ্গটি মূল্যবান আমার কাছে, তার একটি কারণ ব্যক্তিগত, অন্যটি কখনোই এবং একমাত্র ব্যক্তিগত নয়। সন্দীপন থেকে আমি নিজে কী পেয়েছি তা এখানে উহ্য রাখা গেল এই ভয়ে যে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা খানিকদূর পর্যন্তই যায়– ক্ষেত্রবিশেষেই মাত্রা তা আরো টানা চলে।

সব মানুষই আপন জগৎ সীমিত করে নেয়। আমিও তা নিয়েছি। খুলনার পরিচয় আমি পুরো তুলে ধরতে পারি না– সে চেষ্টাও করি না। এই বিচিত্র ভূখণ্ড সম্বন্ধে আমি জানিই বা কতটুকু? যে বাইরে থেকে ভিতরে আসে, যে নতুন করে জন্ম নেয়, একটি নতুন দেশ যার অধিগ্রহণ করে, জীবন-মাকড়সার জটিল জালে যে আটকে যায়, আমার অবস্থা যেন তাই। এখন আমি ভিতরের লোক।

amarboi.com

উত্তরের উপেক্ষিতা

সব মফস্বল শহরেরই নিজস্ব চেহারা আছে। অন্তত বিশ-পঁচিশ বছর আগে ছিল। আধুনিকতা তখনও আমাদের মহকুমা আর জেলা শহরগুলোকে কিম্ভূত করে তুলতে পারেনি। এক একটি মফস্বল শহরের কী তীব্র স্বকীয়তার বিশিষ্টতার ঝাঁজ, কাঁচা গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি কবিরাজি ওষুধের মতো। প্রতিটি শহরের ছিল নিজের আকাশ, নিজের গাছপালা, নদী মানুষ। আদিবাসী কুমারীদের সঙ্গে আধুনিক তরুণীদের যে তফাত, আজকের আধুনিক শহরের সঙ্গে পুরনো মফস্বল শহরের প্রায় তেমনিই তফাত।

দু-দশক আগে, যখন উত্তরের এই জেলা শহর রাজশাহীতে প্রথম আমি, 'আমনুরা জং'-গামী মৃদুগতি ট্রেন থেকে রাজশাহী স্টেশনে এসে নামি, সঙ্গে সঙ্গে পাই স্বকীয়তার গন্ধ। কেমন সে গন্ধ ঠিক বলতে পারি না– তবে যেখান থেকে এসেছিলাম সেই খুলনার সোঁদা ভিজে স্যাঁতসেঁতে গন্ধের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক ছিল না একথা বলতে পারি। অন্তত একটি গন্ধের কথা এক্ষুনি বলে দেওয়া যায়। কারো সাধ্য নেই তা উপেক্ষা করার– নবাগতের তো নয়ই। তা হলো ঘোড়ার গন্ধ। ঘোড়ার গন্ধ বলতে যা যা বোঝায় সবই। ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, তার ঘাম, মূত্র এবং বিষ্ঠার গন্ধ। ওদিকে খুলনায় তো ঘোড়া প্রায় বিলুপ্ত প্রাণী– একটিও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এদিকে রাজশাহীতে পা দিয়েই ঘোটকচালিত শকট ছাড়া উপায় নেই। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজশাহীতে রিকশাঅলারা কোণঠাসা, ঘোড়ার দাপট রাস্তা জুড়ে। ঘোড়ার গাড়ি, রাজশাহীতে যার নাম টমটম– রাস্তার মালিক ; রিকশা সংকুচিত থাকত, পথচারী তো ভয়ে কাঁটা। ঘোড়ার গাড়ির আরোহী আর গাড়োয়ান বিজয়গর্বে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে, পাথুরে রাস্তা থেকে শব্দ উঠছে খটখট, চোখে ঠুলি ঘোড়া চলেছে দুল্‌কি চালে, বাতাসে শণের দড়ির শক্ত চাবুকের শব্দ 'সাঁই', গাড়োয়ানের গলার আওয়াজ, 'যাবেন যাবেন, যাঃ শালা।' প্রথম দুটি শব্দ পথচারীর উদ্দেশে, দ্বিতীয় শব্দ দুটি ঘোড়ার উদ্দেশে। ভুল করে আপনি পথচারী সব গুলিয়ে ফেলতে পারেন– সেজন্যে গাড়োয়ান

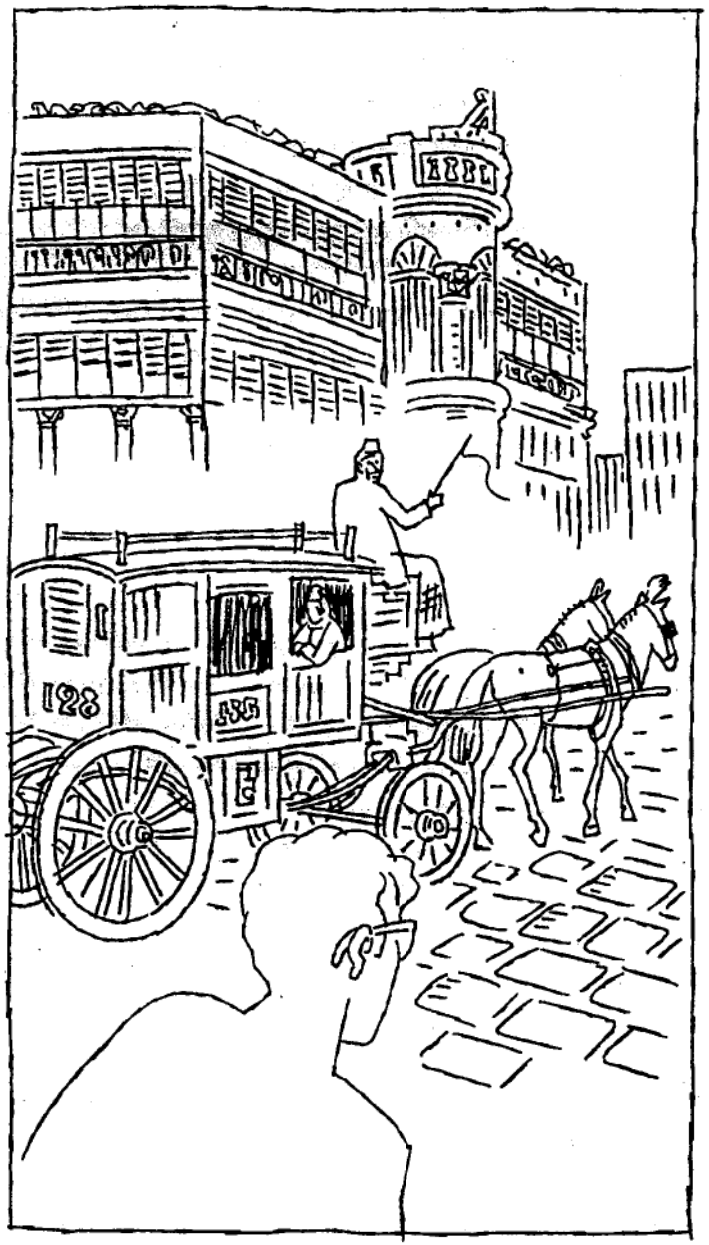

দায়ী নয়। আমি এর মধ্যে রসিকতা আবিষ্কার করতে পারিনি, গাড়োয়ানের চোখে কোনোদিন দেখিনি কৌতুকের ঝিলিক। আমাকে বলতেই হবে, ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানদের মতো এখানকার গাড়োয়ানেরা রসবোধের জন্যে প্রসিদ্ধ নয়। আর এখানকার ঘোড়ারা হচ্ছে ভারবাহী পশু, তাদের রসিকতার প্রশ্নই ওঠে না। তবে ঘোড়াদের পক্ষে যতটা রসিক হওয়া সম্ভব তারা ততটা ছিল কিনা আমি জানি না। তাদের প্রত্যেকেরই চোখে ঠুলি, আমি কারো চোখ দেখতে পাইনি। রাজশাহীর টমটমের ঘোড়াদের পক্ষে মানবজাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও ধিক্কারপূর্ণ এক ধরনের শুকনো ধারালো শ্লেষ ও বিদ্রূপের ভাব থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু যেভাবে তারা ঘাড় নামিয়ে চুপচাপ দানা খেত, গাড়োয়ানদের কোলের উপর পা তুলে দিয়ে খুরে বাটালি বানাতে দিত আর পিছনের দুই পা ফাঁক করে কোমর আর পাছা নামিয়ে দশ মিনিট ধরে মূত্রত্যাগ করতো, তাতে মনে হত তাদের মতো নিরীহ হতভাগা জানোয়ার দুনিয়ায় নেই। আসল ঘোড়ার কত প্রজন্ম পরে আর কত ধরনের গাধার সংমিশ্রণে এদের জন্ম তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

মানুষের দিক থেকে ঘোড়ার দিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া শোভন, এই লেখাটায় বোধহয় তার চেয়ে বেশিই দেওয়া হয়ে গেল। অন্য কথায় আসার আগে এ প্রসঙ্গে একটি সংবাদ দিচ্ছি : রাজশাহীতে ঘোড়ার গাড়ির এই ঐতিহ্য এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে, রাস্তায় টমটমের স্রোত শুকিয়ে গেছে। বোধ হয় আধুনিকতার আর একটি ক্যাজুয়ালটি।

পঁচিশ বছর আগে প্রথম যখন রাজশাহীতে আসি তখন আমার মনে হয়েছিল, রাজশাহী সেই শহরগুলিরই একটি যে আগাগোড়া অতীতে ডুবে থাকে। লোকপরিপূর্ণ হলেও এমন শহরকে জনহীন পরিত্যক্ত, বড়ো বড়ো দালান কোঠাকে শূন্য, আর যেসব মানুষজন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তাদের অস্তিত্বকে কেমন বায়বীয় বলে মনে হতে থাকে। জুন মাসের এক সকাল বেলায়, তখন রাজশাহী আলোয় ঝকঝকে, লোকেরা সবাই কাজে বেরিয়েছে— আমি রাস্তায় পা দিয়েই কেমন অদ্ভুত পুরনো এক জগতে এসে পড়লাম। জানি এটা আমার বিভ্রম মাত্র। তবে অনেক কারণেই এমন মনে হয়েছিল। রাজশাহীতে এসেই আপনি এটা লক্ষ না করে পারবেন না যে শহরে পুরনোকালের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। চুনবালি খসা পুরনো দালান সরু সরু পাতলা ইটে গাঁথা। অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট বাড়ি, চারিদিকে উঁচু

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এমন বাড়ির প্রত্যেকটিরই দীর্ঘদিনের রহস্যময় আলাদা আলাদা ইতিহাস আছে বলে মনে হয়। অনেক উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়বে পাঁচিলের আওতার মধ্যে মূল বাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গায় বিরাট বিরাট প্রাচীন গাছের বাগান। তাও রহস্যময়, নির্জন, ঠান্ডা। কোনো একটা জায়গায় পাঁচিল ভেঙে গেছে দেখে প্রবল কৌতূহলের টানে ভিতরে উঁকি দিতে ইচ্ছে করে। আর উঁকি দেবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যেন চলে যেতে হয় অনেক পিছনে উনিশ শতকে বা আঠারো শতকের শেষে। গা ছমছম করে। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় তলাটা অন্ধকার, দুর্ভেদ্য কাঁটাগাছের জঙ্গল, জায়গায় জায়গায় ধস নেমেছে, একটানা ঝিঁঝি-র শব্দ, সমস্ত দুপুর জুড়ে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে ঘুঘু ডাকছে। হঠাৎ হয়তো ঝোপের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে একটা খরগোশ বেরিয়ে ছুটল। এইরকম ছবি। প্রত্যেকটি মফস্বল শহরের যে একটি আলাদা চেহারা ও চরিত্র গড়ে ওঠে বলছিলাম, তার উপাদান আসলে এগুলিই। এরকম পুরনো বাড়ি তো খুলনায় দেখা যায়নি। রাজশাহীতে এমন পুরনো বাড়ি অজস্র আছে। এককালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস ছিল এমনই একটি পুরনো বাড়ি। শহরের মাঝামাঝি ঘোড়ামারা এলাকায় দালানটি এখনও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যি ছেড়ে দিয়েছে। এ ধরনের বাড়ির সংস্কার করা প্রায় অসাধ্য। তার চেয়ে কম খরচে নতুন বাড়ি তৈরি করে নেওয়া যায়। যতদূর দেখতে পাই সেখানে এখন উদ্বাস্তু বা ভিখিরিদের বাস। আর একটি বাড়ি এককালে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন। এ বাড়িটার নাম সবাই জানে— বড়োকুঠি। শাদা রঙের এই প্রাসাদটি পদ্মার তীরে এখনও রয়েছে। পদ্মার ঢেউ এসে তার ভিতে ধাক্কা দেয়। দূর থেকে মনে হয় বড়োকুঠি পদ্মার জলের ভিতর থেকে উঠেছে। তিনশো বছরের কাছাকাছি বয়েস হয়েছে। দুর্গের মতো— শাদা, ন্যাড়া উঁচু দেয়াল। ভিতরে বড়ো বড়ো ঘর। প্রথম দিকে যখন খুবই গরিবি হালে বিশ্ববিদ্যালয় চলত তখন এই বড়ো বড়ো ঘরগুলিতেই পার্টিশন দিয়ে অনেকগুলো খুপরি বানিয়ে তাবৎ প্রশাসনিক কাজ চালানো হত। শুধু তাই নয়, দোতলায় আবার স্বয়ং উপাচার্য সপরিবারে বসবাস করতেন। বেশ কুলিয়ে যেত। বড়োকুঠি এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আসছে। নেহাত রাক্ষুসি পদ্মা একদিন গপ করে গিলে না ফেললে, বাড়িটা যে শিগগির ধ্বংস হয়ে যাবে এমন মনে হয় না।

এইরকম পুরনো বিশাল দালান-কোঠা, ভাঙা বা আস্ত বাড়ি, জনহীন

amarboi.com

ধ্বংসস্তূপ, শহরের উত্তরদিকের ঝুপসি অন্ধকার আমবাগান, লতাপাতায় ঢাকা ভেঙে-পড়া মন্দির– অতীতের এমনি সব নানা চিহ্ন রাজশাহীতে ছড়িয়ে আছে বলেই হয়তো প্রথমে আমার মনে হয়েছিল শহরটি অতীতের জালে আটকানো। আর শহরের দক্ষিণে সেই অনিবার্য বিশাল পদ্মা তো আছেই। চওড়া উঁচু একটি বাঁধ শহরটিকে রক্ষা করছে সত্যি– কিন্তু বাঁধের এদিক থেকে পদ্মা চোখেই পড়ে না। তবে বাঁধের উপর উঠে দাঁড়ালেই চোখের সামনে খুলে যায় মনকে এককালে গ্রাস করার মতো দৃশ্য। পদ্মা পাঁচ ছ-মাইল চওড়া, বাঁধের উপর থেকে অন্যদিকের তীর চোখে পড়ে না। শীতের দিনে রুপোর পাতের ফিতের মতো ঝকঝকে মূল স্রোতটি দেখতে পাওয়া যায়। বালির চর পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুতে হয়। শীতের দিনে পদ্মার করুণ দৃশ্য দেখা যাবে ; মাইল খানেক ভিতরে গিয়ে বালির চরে দাঁড়ালে কেমন অপার্থিব, প্রায় ভৌতিক স্তব্ধতা চেপে ধরে। এখানে সেখানে বালির মধ্যে জল বেধে আছে—যেসব চরের উপরে কালো সরের মতো পলি জমেছে, কৃষকরা বহু কষ্টে সেখানে সরষে ইত্যাদি রবিশস্যের চাষ করে।

কিন্তু প্রথম শরতে এই পদ্মার দিকে চাইলেই বুক কেঁপে ওঠে। ময়লা ঘোলা উন্মত্ত জলে সমস্ত চর ডুবে গিয়ে পদ্মাকে পারহীন তলহীন মনে হয়। প্রবল স্রোতে শহরের বাঁধ ভিতরে ভিতরে কেঁপে ওঠে– জায়গায় জায়গায় ধ্বসেও যায়।

পদ্মার অনিঃশেষ আদিমতার সঙ্গে রাজশাহী শহরের ভিতরের আবহাওয়া কোথায় যেন চমৎকার মানিয়ে গেছে।

পঁচিশ বছর আগে ছাপ্পান্ন সালে শহরে একমাত্র রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজ নেই। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা, চুপিচুপি একশো বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেননি, পাছে আবার ঐতিহ্যসচেতন বলে আমাদের দুর্নাম হয়। ব্রিটিশ আমলের বাড়ি সাধারণত যে ধাঁচের হয়—লাল রঙের, ভারি ও মজবুত গড়নের দালান, চওড়া দেয়াল, একটু ভিতরে বসানো সেগুন কাঠের জানলা, বিরাট বিরাট দরজা। কলেজে ঢোকার মুখে প্রথম দালানটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমবোধ হয়। এইরকম আরো কয়েকটি দালান ভিতরে আছে। ঠিক পাশে কলেজের চেয়েও কিছু পুরনো কলেজিয়েট ইস্কুল। এই বিরাট এলাকার সবটাই নীচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা– খেলার মাঠ, অধ্যক্ষের বাড়ি, ছয়টি বড়ো বড়ো দোতলা ছেলেদের হস্টেল ইত্যাদি। এখন আরো কিছু কিছু বাড়িঘর যোগ হয়েছে নেহাত প্রয়োজনের

জন্যেই। সেগুলি কেমন দেখতে হয়েছে মন্তব্য করা একেবারেই বারণ। এখন আরো তিনটি সরকারি কলেজ হয়েছে– নিউ ডিগ্রি কলেজ, মহিলা কলেজ ও সিটি কলেজ। প্রথম কলেজটির নামের দ্বারা কলেজটি নতুন, না ডিগ্রি নতুন কী বোঝানো হচ্ছে বলা মুশকিল। বোধহয় দুটিই। ষাট সালের দিকে পুরনো লোকনাথ স্কুলের কাছে চেয়েচিন্তে সন্ধের দিকে বাড়ি ধার নিয়ে সিটি কলেজ চালু হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও পরিত্যক্ত ভোলানাথ স্কুলের এক ঘরে লাইব্রেরি, অন্য খুপরিগুলোতে বিভিন্ন বিভাগের কাজ চালাতেন। এ ছাড়াও এখন শাহ মখদুম কলেজ হয়েছে। এত কলেজ চলে কিনা জানি না, তবে সরকারি কলেজগুলো বাদে অন্য কলেজের অধ্যাপকরা অনিয়মিত বেতন পেয়ে থাকেন তা জানি। কলেজগুলি নিশ্চয়ই চলে, না হলে শিক্ষিত বেকার এমন হুহু করে বাড়ছে কেমন করে? আসছে কোথা থেকে?

একইভাবে ঘোড়ামারার পাবলিক লাইব্রেরিও প্রাচীন হয়েছে। তবে আমাদের এখানে প্রাচীনত্বের মানেই হচ্ছে কাজের বার হয়ে যাওয়া। কিছু মানুষের উদ্যোগ সদিচ্ছা সব সময়েই থাকে– কিন্তু ঐতিহ্যরক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে অতীত-কীর্তিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে সাধারণ বন্ধ্যাদশা এখন চলছে, তা থেকে আত্মরক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হবে? বরেন্দ্র মিউজিয়ামে যে অমূল্য সম্পদ এককালে সংগৃহীত হয়েছিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে বলেই এই জাদুঘর এবং তার গ্রন্থাগারটি এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই জাদুঘরটিও পঁচিশ বছর পূর্ণ করেছে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মৌন অবলম্বনই বিধেয় জ্ঞান করেছেন।

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই নিশ্চয় এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাতান্ন-আটান্ন সালে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবটাই শহরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। এখন যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়– শহর থেকে তিন মাইল দূরে সেই মতিহার এলাকা কুড়ি বছর আগে কেমন ছিল কল্পনা করাও কঠিন। টমটমে চেপে দলবল নিয়ে এখানে শখ করে লোকে পিকনিক করতে আসত। আমরাও এসেছি! নির্জন ভাঙাচোরা নাটোর রোডের পাশে এই বিরাট এলাকাটা এমনকী চাষবাসেরও অনুপযুক্ত ছিল। প্রায়ই পতিত জমি, এখানে সেখানে ছোটো ছোটো জলা বা ডোবা, মাঝে মাঝে ধানের খেত, এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু জমিতে আমবাগান আর নানাজাতের বড়ো বড়ো গাছ। রাস্তার পাশে একটিমাত্র ভাঙা দালানবাড়ি–

তার পাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা নীল তৈরির কুঠরিগুলো মাটির তলায় চলে গেছে। এমন খবরও শুনেছি, সেখানে নাকি অজগর ধরা পড়েছে। ছাগল গিলছে এই অবস্থায় ধরা পড়েছে। মনে হয় গল্প যে বানিয়েছিল সে অজগরের মানে জানত। অজগরের কথা বলতে পারি না– তবে এই পোড়ো জমির অজস্র গর্তে দেদার গোখরো সাপ থাকত। তাদের এখনও দেখা যায়!

আটান্ন-ঊনষাট সালের দিকেও এই বিরাট এলাকায় একটিমাত্র বড়ো বিল্ডিং– বিজ্ঞান ভবন। নাটোর রোডের পাশের দালানটিকে সংস্কার করে নিয়ে লাইব্রেরি বসানো হলো আর গোটা কয়েক টিনের শেড তুলে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে সেখানে নির্বাসনে পাঠানো হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাকে কাগুজে ভাষায় বৈপ্লবিক বললে সত্যিই বেশি বলা হয় না। তবে টিনের শেডগুলি এখনো আছে– বর্ষার দিনে নানা আপত্তিকর আবর্জনাসহ বাইরের থইথই জল ঘরের মেঝে ডুবিয়ে দেয়। তখন 'শান্তিনিকেতন' 'ছায়ানীড়' 'নিরিবিলি' ইত্যাদি চকখড়িতে নাম লেখা ঘরগুলির বাসিন্দারা উপাচার্যের অফিসে এসে গলার জোরের পরীক্ষা দিয়ে যায়। এই শেডগুলিকে নিয়ে লোহার গেট তৈরি করে নতুন নাম দিয়ে এখন একটি পূর্ণ ছাত্রাবাস স্থগিত হয়েছে। বর্ষাকালের ব্যবস্থাও তা হলে নিশ্চয় হয়েছে।

নতুন পুরনো রাজশাহী একবার নিরাসক্তভাবে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। শহরের ভিতর দিয়ে একটিমাত্র মুখ্য রাস্তা– নাটোর রোড। কোর্ট হয়ে, প্রেমতলী গোদাগাড়ি হয়ে নবাবগঞ্জ গেছে। আর একটি মূল রাস্তা স্টেশন থেকে শহর পর্যন্ত। এখনো তাই আছে। তবে শহরের উত্তরদিক ঘিরে গ্রেটার রোড নামে খুব চওড়া একটি রাস্তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ পরিষদের কাছ থেকে বেরিয়ে স্টেশনের কাছে গিয়ে কী রকম অস্পষ্ট সন্দেহজনভাবে মিলিয়ে গেছে। আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকে রাস্তা ঘাট বাঁধাই-টাঁধাই কিছু হয়েছিল– সেগুলো যা হোক টিকে আছে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু সংস্কারও হয়। নতুন দালান-কোঠা বলতে মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, নতুন বোর্ড অফিস, নিউ ডিগ্রি কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বেতার ভবন, কিছু গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সবার উপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। জনসংখ্যা বাড়ছে– কাজেই ব্যাবসা বাণিজ্য, কন্ট্রাক্টরি ইত্যাদির কাঁচা অঢেল টাকায়, ঘুষের টাকায় বা মাস্টারির কষ্টার্জিত একটি একটি ইট দিয়ে শহরে অনেক নতুন বাড়ি উঠছে। বাইরে থেকে এর বেশি

উন্নতি দেখতে পাইনি– ভিতরে ভিতরে কী অসাধ্যসাধন করে ফেলা গেছে তা আমার জানার কথা নয়।

আমি তো এই দেখতে পাই শহরে সংস্কৃতির স্রোত একেবারে বন্ধ। সেখানে খরার পদ্মার চেয়েও বড়ো চড়া পড়ে গেছে। প্রায় কিছুই হয় না। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তত্ত্বগতভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলের জ্ঞান ও সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্র। তত্ত্ব ও বাস্তবে ফারাক দেখা যায়– কিন্তু কে স্থির করে দেবে সেই ফারাক কত দূর যেতে পারে। বাইরে থেকে দু-দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে ছবির মতো সাজানো এই বিশাল ক্যাম্পাস দেখে যে কেউ ন্যায়ত চেঁচিয়ে বলবেন, এই পরিবেশ, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ইত্যাদিতে আমি মুগ্ধ, অভিভূত। কিন্তু তিনি জানেন না এই সরসতার তলায় শুকনো রসহীন মরুভূমি। আশ্চর্যের ব্যাপার, যেটুকু বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ আছে তার কোথাও এমনি একটি ছোট্ট ক্ষেত্র নেই যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহর পরস্পরের দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকায়। না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, নির্মম নিষ্ঠুর রিক্ততাই এর কারণ। সমাজ থেকে, জীবন থেকে আমাদের দেশের জীবনপ্রবাহের মূল ধারা থেকে শিক্ষিত মানুষের এই সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা কোথায়? শিক্ষিত মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য সমস্ত সমাজের পটে হাস্যকর গলগণ্ডের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির ঠিক বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব আর প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীরাও পরস্পরের কাছে এতটা বিদেশি নয়। চারিদিক থেকে বালির চড়া এগিয়ে আসছে। এখন এই বালিতেই উটপাখির মতো গর্ত খুঁড়ে আত্মরক্ষা না করে উপায় নেই।

রাজশাহীর পিছনে বিশাল ও উজ্জ্বল অতীত আছে, বাংলাদেশের অন্ধকারতম কোণে তার কর্ম, জ্ঞান ও মেধার আলো পৌঁছেছিল– এই সেদিনও পদ্মা নাব্য ছিল, অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগ ছিল বিস্তৃত– এসব কথা আমরা সবাই জানি। আজ রাজশাহীর দিকে তাকালে কষ্ট হয়, গত পঁচিশ বছরে অতীতকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায়নি, তাকে রক্ষা করাও যায়নি। সব জায়গায় কেমন একটা অস্বস্তিকর মেশামেশি। পুরনো আমলের বাড়িগুলো রয়েছে– ভেঙে ধসে পড়ছে কোথাও, কোথাও সংস্কার করে নিয়ে ব্যবহার চলছে– পাশে দাঁড়িয়ে আধুনিক কেতার দালান-কোঠা। অদ্ভুত মিশেল। আমি না পারি অতীতে ফিরতে, না দেখতে পাই নতুন কাল। এখানে বসবাস এখন এমনই দোটানার মধ্যে।

amarboi.com

ভিতরের খানিকটা

ঘরে ঢুকতেই একটা দোনলা বন্দুক নজরে পড়ল। দেখেই বোঝা যায় বহুকালের পুরনো জিনিশ যত্নে রাখা হয়েছে বলে এখনো টিকে আছে। টিকে আছে বলা ভুল হলো, চমৎকার রয়েছে দেখলাম। নল দুটির উপর তেরছা আলো পড়ায় নীলচে একটা আভা ঝলকাচ্ছে। এ ধরনের জিনিশ শিল্প সভ্যতার সেই পর্যায়ে তৈরি, যখন উপযোগিতার চেয়ে স্থায়িত্বের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হত। কী কী সুবিধে আছে জিজ্ঞেস না করে ক্রেতা যখন প্রথমেই জানতে চাইত, টিকবে কদিন?

গৃহস্বামী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সম্ভাষণ অভিবাদন ইত্যাদির বিনিময়ের পরে ঘরে নিয়ে বসালেন। শহর থেকে আট-দশ মাইল দূরে গাঁয়ের মধ্যে বিঘে দশেক জমির উপর বাড়ি। উত্তরবঙ্গের এই অংশ সমতল এবং প্রায় বৃক্ষশূন্য। কাজেই অনেক দূর থেকেই বাড়িটি দেখা যাচ্ছিল। সোনালি রঙের মাঠের উপর শাদা রঙের বাড়ি ঝকঝক করছে। কাছে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির চৌহদ্দির দশ বিঘে জমির প্রায় কিছুই ফেলে রাখা হয়নি। শীতের সব ফসলই রয়েছে– কয়েক বিঘে জমিতে নানা জাতের আলু, টোমাটো, পেঁয়াজ, বেগুন, গাজর, পালং এইসব। ফসল দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাশেই দুটি বাঁধাঘাট-অলা পুকুর। মেয়েদের ঘাটটি বড়ো বড়ো গাছ লতাপাতা নীল অপরাজিতায় ঢাকা। বাইরের দিকের ঘাটটির উপর বিরাট বকুল গাছ। বর্ণনাটা একটু বেশি কেতাবি হয়ে যাচ্ছে স্বীকার করি। পাঠক মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন, হ্যাঁ, বইয়ে এইরকমই লেখা থাকে বটে! তা বাংলাদেশের কোথায় এসব আছে?

আছে বই কী! না থাকলে আমি দেখলাম কী করে? তবে কার আছে সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা। এই বাড়ির যিনি মালিক, তিনি ছিলেন আমার সতীর্থ। আমরা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি। বিশ বছর পর গতকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। বলতে কী এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রায় কোনও পরিবর্তনই হয়নি তাঁর চেহারার।

যেন কালো পাথর থেকে বাটালি-হাতুড়ি দিয়ে কুঁদে তোলা দীর্ঘ উন্নত দেহটি। বয়েস বোঝা যায় শুধু তাঁর সমস্ত শরীরে জড়িয়ে থাকা একটা অদ্ভুত জড়তা থেকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে কোথায় যেন বাসা বেঁধেছে অবসাদ। এই জিনিশটা অবশ্য গতকাল বিকেলে ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আজ বেশ চোখে পড়ছে। দেখা হয়ে যাওয়ার পর আর কিছুতেই ছাড়েননি তিনি। আজ দুপুরে তাঁর বাড়িতে আমাকে খেতে হবে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। পাকা মেঝে পাকা দেয়াল টিনের চাল। বাঁশের তৈরি নীল রং-করা সিলিং। একটু শাদামাটা ধরনের হলেও খুব মজবুত কাঠের সোফাসেট। ধপধপে শাদা কাপড়ের গেলাপ পরানো। কিছু সূচীশিল্পের নিদর্শনও রয়েছে সেগুলোতে। সেখানে বসতেই ন্যাপথলিনের গন্ধে বোঝা গেল আজই গেলাপগুলি ট্রাঙ্ক থেকে বের করা হয়েছে। ঘরের এক পাশে কী বিরাট একটি ছাপ্পর খাটের বিছানা! তার হাতছানি অগ্রাহ্য করা সত্যিই কঠিন। আমি সোফার হাতল চেপে ধরে একদৃষ্টিতে দোনলা বন্দুকটির সূক্ষ্ম কারুকাজ করা ঘোড়া দুটির দিকে চেয়ে থাকি। যে-বস্তু আগুন উদগীরণ করে তাতেও শিল্প!

আমি হাসিমুখে বলি, এটা দিয়ে কী কাজ হয় আপনার? এককালে তো শিকার-টিকার করতেন। এখনো অভ্যেস আছে নাকি! সত্যি বলতে কী, আপনার নামটাও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমার একজন বাঘ শিকারী বন্ধু ছিলেন।

আমাদের এই বন্ধু– ধরা যাক আনোয়ার তাঁর নাম– প্রায় কিশোর বয়সেই তেঁতুলিয়া অঞ্চলে একটি বাঘ মেরেছিলেন। খুব মনে আছে, বাঘ শিকারের কাহিনি শুরু করার আগে তিনি তেঁতুলিয়া অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের বর্ণনা দিতেন। এইরকম শীতের সময় তাঁকে একবার বাধ্য হয়ে কিছুদিন একটা কাঁচা বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। তাওয়ায় গনগনে আগুন তৈরি করে রাখতে হত শোবার খাটের নীচে। তারপর কয়েকটা কম্বল মুড়ি দিলে তবে যদি রাতে ঘুমনো সম্ভব হয়। পর পর কয়েক রাত ধরে নিঃশব্দ-পায়ে শ্বাপদটি মানুষের গন্ধ পেয়ে আনোয়ারের ঘরের চারপাশে ঘোরাফেরা করে, দরজা আঁচড়ে দেয়, উশখুশ করে– এবং শেষ পর্যন্ত যা ঘটার তাই ঘটে। আনোয়ারের গুলিতে মারা পড়ে।

পুরনো প্রসঙ্গ শুনে আনোয়ার হো হো করে হেসে উঠলেন। এই প্রথম

তিনি এত জোরে, প্রায় নিজেকে ভুলে, আগের মতো হাসেন। আমার মনে পড়ে যায় আনোয়ার খুবই হাসিখুশি আমুদে স্বভাবের ছিলেন। অথচ কাল এবং আজও, এই হাসিটুকু বাদ দিলে, কী গুরুগম্ভীর কী ভারিক্কীই না মনে হচ্ছে তাঁকে। হাসতে হাসতে আনোয়ার বললেন, অনেক আগেই চুকেছে ওসব। পাখিটা পর্যন্ত মারি না।

তা হলে আর রেখেছেন কেন?

দুর্জ্ঞেয় মৃদু হাসি ফোটে আনোয়ারের মুখে, পাখি মারি না বটে, তবে ওটা রাখতে হয়েছে দুপেয়েদের ভয়েই। ভুলে যাবেন না আমি গ্রামে বাস করি!

চোর ডাকাতের কথা বলছেন তো? আমি জিজ্ঞেস করি।

শুধুই চোর ডাকাত নয়। তা ছাড়া চোর ডাকাতেরও রকমফের আছে। অবশ্য সেদিক থেকে দেখলে এসব অস্ত্র জাদুঘরেই রাখা উচিত। এটা থেকে দুটো বুলেট বের হতে হতে আমার সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। তবু রেখেছি ওটা। সংস্কার বলতে পারেন।

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক, সরকারি বেসরকারি বহু তরফেই অস্ত্রশস্ত্র আছে, সে-সবের সদ্ব্যবহারও হয় মানি, কিন্তু তাতে আপনার কী? আপনার আবার ভয় কাকে?

আমার একটু ভয়ের কারণ আছে বই কী! আমার অপরাধ হচ্ছে আমি চার পাঁচশো বিঘে জমির মালিক।

কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম– বন্ধুর কথা শুনে আমার কথাটাকে সশব্দে গিলে ফেলি। এই লোকটি চার-পাঁচশো বিঘে জমির মালিক! ছাত্র জীবনে ঘুণাক্ষরে একথা মনে হয়নি। গতকাল বিকেলে যখন দেখা হলো তখনও এ-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করা যায়নি। আজ এখানে এসে ঘরদোরের পরিপাট্য দেখে মনে হয়েছিল বটে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। কিন্তু তার বেশি আর কিছু আন্দাজ করতে পারিনি।

আমার অবস্থা দেখে আনোয়ারের বোধহয় একটু মায়া হলো। তিনি বললেন, ভয় নেই, আমি আলোকিত জোতদার। যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন। দোনলা বন্দুক দিয়ে আমার সম্পত্তি হয়তো আজ আর রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আশঙ্কার কারণও কিছু নেই। আমার সম্পত্তি আমার সদাশয় সরকারই রক্ষা করবে।

আমি একটু সামলাতে পারি এতক্ষণে, হেসে বলি, সব সরকারই?

amarboi.com

হ্যাঁ– এতদিন পর্যন্ত তাই হয়ে এসেছে। সরকার আমাদেরই– জমির পরিমাণ বেঁধেই দিক আর তুলেই নিক। দু-পায়ের উপর দাঁড়াতে সরকারের যতটা জোর লাগে, তার তিনভাগ আমরাই জুগিয়ে থাকি। অবশ্য আমার কথা হচ্ছে না, আমি চুনোপুঁটি মাত্র। রুই কাতলাদের সঙ্গে তো আপনার দেখাই হয়নি এখনও!

আলোকিত জোতদারটির মুখের দিকে চেয়ে থাকি আমি। মৃদু মৃদু হাসছেন আনোয়ার। তাঁর কুচকুচে কালো চোখের তারা দুটিও খোশমেজাজে কৌতুকে হাসছে।

বন্দুকটার উপর থেকে আমি চোখ সরাই না। আনোয়ার যে সত্যিই পাকা শিকারি তাতে আমার কোনো সন্দেহ থাকে না।

আমি কী জিজ্ঞেস করব আগেভাগেই একরকম করে বুঝে নিয়ে তিনি বললেন, মারা পড়িনি কেন তাই জিজ্ঞেস করছেন তো? আপনাকে বললাম না, আমি চুনোপুঁটি– দোহাজারি পাঁচহাজারি রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে এখনও আপনার সাক্ষাৎ ঘটেনি। তবু কিন্তু আমি চিঠি আর দশ টাকার একটা নোট পেয়েছিলাম। শেষে একদিন রাত বারোটার পর যোগাযোগ ঘটে গেল। কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। শেষে বললাম, আমি মার্ক্সবাদ পড়েছি। চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি আমাকে শ্রেণিশত্রু বলা চলে না, আমি খুবজোর বড়ো কৃষক বা ধনী কৃষক। আমার বাপ এই সম্পত্তি আমার জন্যে রেখে গেছে, সে কি আমার দোষ? সব কিছু ছেড়ে দিতে আমার একফোঁটা আপত্তি নেই! কিন্তু কাকে দেব বলে দিন। বর্তমান আইন না বদলালে সব কিছু আমার। যান, আগে ক্ষমতা দখল করে আইন বদলান, আপ্‌সে আমার সব সম্পত্তি জনগণের হাতে চলে যাবে। সব কিছু আগের মতো থাকবে, শুধু আমাকে মেরে লাভ কী হবে? আমার লাশ পড়লে লাশের ওপরেই আমার ওয়ারিশান এসে দাঁড়িয়ে যাবে!

এই সময় ঘরে আনোয়ারের স্ত্রী ঢুকলেন। ছোটোখাটো চটপটে ফর্শা স্বাস্থ্যবতী তরুণী। খুবই হাসিখুশি। স্বামীর প্রতি মুহুর্মুহু তম্বি চলতে লাগল তাঁর। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, দুপুরে খাবার আগে আমি আর কিছু খাব কিনা। আমি জানলা দিয়ে শীতের দিনের দুপুরের একটু কড়া রোদের দিকে চেয়ে আছি। আকাশ-ভর্তি আলো। প্রায় কালোর কাছাকাছি ঘনসবুজ আলুর খেত আর তার পাশে শাদাটে সবুজ ফুলকপির জমির মধ্যে কোমরে ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো খালি-গা কুচকুচে কালো জন তিনেক মজুর কাজ

করছে। তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি মহিলার দিকে চেয়ে বলি, না, আমি এখন কিছু খাব না। আনোয়ার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এঁরা পেটরোগা মানুষ। খাওয়ার এক তিল এদিক ওদিক হলেই মুশকিল। তুমি দুপুরের জোগাড়যন্ত্র করো, আমি এঁকে একটু ঘুরিয়ে খিদে বাড়িয়ে নিয়ে আসছি।

আমারা ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরের বাঁধাঘাটের পাশে বকুলতলায় আসি। ঠান্ডা নির্জন জায়গাটি। সেখানে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে আনোয়ার তাঁর বাড়ির চৌহদ্দি নির্দেশ করতে থাকেন। ফাঁকা মাঠে দশ বিঘে জমি তেমন বড়ো বলে মনে হয় না। কিন্তু দশ বিঘে জায়গা মোটামুটি বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললে একটা বিরাট ব্যাপারই দাঁড়ায় বটে। আনোয়ারের বাড়ির চৌহদ্দি যেন শেষ হতে চায় না। আমি ছেঁড়া চটের দরজা-অলা, জবুথবু ট্যারা-ব্যাঁকা কয়েকটি মাটির বাড়ি দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ওখানে কারা থাকে?

যারা আলু আর কপির জমিতে কাজ করছিল তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে আনোয়ার বললেন, ওরাই থাকে ওখানে ছেলে-মেয়ে বউ নিয়ে।

আপনার জায়গা তো?

হ্যাঁ, আমি জায়গা দিয়েছি ওদের। তার চেয়ে বরং বলা চলে আমিই বসিয়েছি ওদের ইচ্ছে করে। জায়গা ছেড়ে দিয়েছি, খড়কুটো জোগাড় করে কোনওরকমে একটা কুঁড়ে-টুড়ে বানিয়ে ওরা থাকে। আসল কথা কী জানেন, ওদের কেউ কেউ অনেক আগে থেকেই ওখানে আছে। আমার বাপ জায়গা দিয়েছিলেন ওদের। তারপর থেকে ওখানেই বাস করছে ওরা।

কোনো খাজনা-টাজনা ওরা দেয় নাকি আপনাকে?

আরে না না– এমনিই থাকে।

ইচ্ছে করলে তাড়াতে পারবেন ওদের?

মৃদু হাসিতে আনোয়ারের দু-চোখের কোণের মাংসপেশি কুঁচকে যায়, তা পারি না আবার, নিশ্চয়ই পারি। বন্দুকটা আছে কী জন্যে! এই বলে হাসি থামিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

একটু পরেই আবার বললেন, নাঃ, ইচ্ছে করলেও উঠিয়ে দিতে পারি না আমি। তাতে আমার কোনো লাভ নেই।

কেন?

একটা সোজা হিসেব করি আমি। ওরা অনেক দিন আছে ওখানে। ওদের অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন দেখিনি আমি। গত তিরিশ বছর ধরে দেখে আসছি– কোনো পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন এই দেখছি যে একটা দুটো করে

মরতে শুরু করেছে এইবার। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন– ঠিক না খেয়ে নয়– সেটা এখনো আমি ঘটতে দিচ্ছি না, তবে আর বেশি দিন ঠেকাতেও পারছি বলে মনে হয় না। সরাসরি না খেয়ে মরছে না– তবে দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে, না খেয়ে, পশুর অখাদ্য খাদ্য খেয়ে এবং গত তিন-চার বছর প্রায় কিছুই না খেয়ে ভালো মড়ক লেগেছে। এইবার আমার হিশেবটা শুনুন। সারা জীবন ওদের একজনও তো বসে থাকতে পারেনি। সরকার যতই বলুক, আমাদের বসে থাকলে চলবে না, আমাদের কাজ করতে হবে, উৎপাদন বাড়তে হবে– আসলে এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কেউ বসে থাকে না। অবশ্য সব সরকারকেই রাজনীতি করেই ক্ষমতায় থাকতে হয়। আমি নিজেও সরকার পক্ষের লোক, বুঝি সবই। কিন্তু সত্যি কথাটা আপনাকে বলছি। বসে থাকার কোনও উপায় নেই ওদের। আখমাড়াই কল যেমন আখের রসটুকু নিংড়ে ছিবড়েটা বের করে দেয়, ঠিক সেই ভাবেই আমি ওদের শ্রম নিংড়ে নিচ্ছি। এই খবরটা আমি ছাড়া আর কেউ তো ভালো জানবে না। তা হলে বলুন, ওদের অবস্থার কোনো উন্নতি নেই– অথচ শ্রম ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে। আমার এখানেই ঢালছে জীবনের শ্রম। কাজেই ওদের স্রেফ টিকিয়ে রাখার দায়িত্বটা নিলে লাভ তো আমারই। আমি ওদের তাড়াতে যাব কোন্ দুঃখে? এইজন্যে বমন ধান দিলাম, ধানের অর্ধেক ভাগ নিল না কত নিল আমি আর হিসেব নিকেশ করতে যাই না। ওদের আমার পরিবারের লোক করে নিয়েছি। ডাকি দাঁড়ান ওদের একজনকে। চাচা এদিকে এসো– আনোয়ার গলা চড়িয়ে ডাক দেন।

আলুর জমিতে কাজ করছিল যে লোকটি সে মাথা উঁচু করে দেখে কাজ ফেলে এগিয়ে আসে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বেধড়ক কাশতে শুরু করে দেয় সে। পরনে একটা ময়লা জ্যালজেলে গামছা ছাড়া আর কিছু নেই। কিটকিটে কালো, সম্পূর্ণত জীর্ণ, রোগগ্রস্ত একটি লোক– বেমক্কা কাশিতে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। আনোয়ারের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, দুম করে বলে দিলেন, তোমাদের দেখতে এসেছেন উনি। এ-কথার সত্যিই কোনো মানে নেই, লজ্জায় লোকটির দিকে তাকাতে পারি না আমি। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে সে আমার দিকে চেয়ে আনোয়ারের কথার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করে। তারপর একটি বিরাট আকর্ণ হাসি তারা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। আমি দেখতে পেলাম, সমস্ত জীবনে কিছুই ঘটেনি তার, কাজেই দেহ জীর্ণ হয়েছে কিন্তু একফোঁটা বয়েস বাড়েনি। একতাল শুকনো কালো রঙের কাদা যেন এলিয়ে পড়ল।

আমি হেসে আনোয়ারকে বলি, আপনার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই এর।

আনোয়ারও হাসেন, ভাগ্যিস নেই।

তারপরেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, যাবেন নাকি ওদের ওদিকটায়? নিজের চোখে দেখলে খানিকটা বুঝতে পারতেন।

কী হবে আর দেখে?

তাই। কী হবে আর দেখে? এই দিকে ওই বড়ো খড়ের চালাঘরটা দেখুন। কিছু জমি আমি নিজেই লোকজন দিয়ে চাষ করাই। তাতে সুবিধে আছে অনেক– খুব ভালো লোন পাই, সার বীজ পাওয়া যায় অল্প দামে, ইচ্ছে করলে সেগুলো বিক্রি করেও দু-পয়সা ঘরে আনা যায়। পাম্পের ব্যবস্থা আছে সেচের জন্যে। এইভাবে চাষবাস করে স্বনির্ভর হওয়া যাচ্ছে, দেশের কাজও হচ্ছে!

আনোয়ার চোখ মটকে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমা করে বলেন, বলছিলাম, ওই বড়ো চালাঘরটায় আমার গরু ছাগল থাকে। বলদ আছে কয়েকজোড়া, টাটকা দুধের জন্যে গাই গরু আছে। ওদের যত্ন করা দরকার। তবু তো ওখানেও জন্ম মৃত্যু আছে, খাটতে খাটতে বলদ বাতিল হয়ে যাচ্ছে, ছুরির নীচে পাঠাতে হচ্ছে তাকে, নতুন নতুন বাচ্চা জন্মাচ্ছে, বড়ো হচ্ছে, শেষে বলদের কাজ করছে। ওইরকম।

ওইরকম মানে? কেমন ভিতরটা শিউরে ওঠে আমার।

ওই ওদের কথা বলছি, মানে আমার পরিবারের শামিল লোকজনের কথা বলছি।

কালো পাথরে কোঁদা আনোয়ারের মুখের প্রতিটি পেশি স্থির। তাঁর ভিতরে হাসি আছে, না তিনি ঠাট্টা করছেন কিছুতেই ধরতে পারি না। ওঁর মুখের চেহারায় ওঁকে আমি তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকি। কোনও সন্দেহ নেই, আনোয়ার কৈশোরেই বাঘ মেরেছিলেন। অনেকক্ষণ দু-জনে চুপচাপ হাঁটতে থাকি। রোদটা বেশ কড়া হয়ে উঠলেও তেমন খারাপ লাগছিল না। একটা জিনিশ আমি খেয়াল করে দেখলাম। কোনও একটা জায়গায় চোখ আটকে রাখার প্রয়োজন নেই। আমি ইচ্ছে করলেই যে দিকে খুশি দৃষ্টি মেলে দিতে পারি। বিশাল সোনালি মাঠের কোথাও চোখ থেমে যায় না।

হতচ্ছাড়া কুঁড়েঘরগুলোর দিকে আর এগোলেন না আনোয়ার।

amarboi.com

কী ভাবছেন? আনোয়ারের নিচু ভারি গলা কানে এল। দেখি মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন তিনি।

না, ভাবব আবার কী? মনে হচ্ছিল কিছু ক্রীতদাসের মালিক হলে মন্দ হত না।

আনোয়ারের গাল আর ঘাড়ের কালো চামড়ার নীচে লাল রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে ওঠে, একথাটা বলা আপনার অন্যায় হলো। প্রায় ওদের মতো কথা বলছেন আপনি।

কাদের মতো?

যারা রাত দুপুরে আমাকে মেরে ফেলতে এসেছিল।

বন্দুক ছিল বলে যাদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন?

না, জিভ ছিল বলে।

হ্যাঁ, খুবই মিষ্টি। আমি হাসি।

না, ওদের আপনি ক্রীতদাস বলতে পারেন না, কারুর কাছ থেকে ওদের কিনিনি আমি। ওরা ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি যেতে পারে।

কিন্তু যায় না কেন?

কোথায় যাবে?

আপনার কাছে থেকে বংশপরম্পরায় আপনার উপকারের ঋণ না শুধে যেখানে খুশি গিয়ে মরতে তো পারে। আমার অসহিষ্ণুতা আর চাপা থাকে না।

অবিকল। এখান থেকে আর কোথাও গিয়ে ওদের মরারও জায়গা নেই। ঠিক এইরকম কিংবা এর চেয়ে ভয়ানক ফাঁদ ওদের জন্যে পাতা আছে। একজনকে ডেকে আপনার সামনে তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলব? দেখবেন, সে সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে, ককিয়ে কেঁদে আমার দয়াভিক্ষা করবে। প্রমাণ চান? আপনি মনে রাখবেন, এই পৃথিবীতে স্রেফ দুটি পা রেখে দাঁড়ানোর জন্যে ওদের কোনও জায়গা নেই। দয়া করে আমি পা দুটি ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শোবার জায়গাটুকু দিয়েছি।

বিরক্ত হয়ে উঠি আমি, কিছু লোকের কথা বোঝা গেল। তা এরকম কত লোক আছে আপনার? গোটা দেশের লোকই এরকম নাকি?

না, না– গলা থেকে সবটুকু ঝাঁজ আর ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে আনোয়ার তাঁর ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসেন, সবাই এরকম হবে কেন? এরকম লোক

আমারই বা কজন আছে? কাজের চাপ পড়লে আমাকে বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসতে হয়।

বাইরে থেকে?

হ্যাঁ, মানে, যারা শ্রম বেচে বেড়ায়।

লোক পান সব সময়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর। কাজ নেই– এইটেই সাধারণ অবস্থা। এক টুকরো জমি নেই, দিনের শুরুতে কাজ জুটল তো পরিবারের লোকজনের চব্বিশ ঘণ্টায় একবার কোনোরকমে খাবার মিলল, না হলে উপোস– এইরকম লোকের সংখ্যাই তো বেশি। দরকারের সময় লোক পাব না কেন? আমার এখানকার ভালো ব্যবস্থার সুযোগ আর কটা লোক পায়? আনোয়ার ফের চিমটি কাটেন।

আপনি গোপনে কৃষক আন্দোলন করেন নাকি?

কী বললেন? একেবারে থেমে গিয়ে আনোয়ার আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তারপর শুরু হয় তাঁর হাসি! তাঁর সেই ঠা ঠা অট্টহাসিতে একটা ন্যাড়া বেলগাছের ডাল থেকে দুটো শাদা বড়ো ঘুঘু ডানা পৎপৎ করে উড়ে পালায়। রোদের সঙ্গে আনোয়ারের হাসি মাখামাখি হয়ে যায়। আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে তিনি হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, কৃষকদের নিয়ে আমাদের দেশে রাজনীতি করতে হলে ঠিক যতটা ভণ্ডামি, বিষয় সম্পত্তি আর সুবিধাসুযোগ থাকা দরকার তার সবই আমার আছে, তা আপনার নজর এড়ায়নি দেখছি।

কথাটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না। আমি বলি, যাদের কথা বলছিলেন তাদের কথা বলুন।

হ্যাঁ, একখানি দেহ সম্বল করে দরজায় দরজায় কাজ খুঁজে বেড়ানোর লোক এখানে প্রচুর আছে। এই এলাকায় আছে, আশেপাশে আছে– অন্যান্য জেলা থেকেও তারা এখানে আসে। আমার ধারণা, দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ এরাই। আপনি রাগ করবেন না, আমাদের মতো আলোকিত জোতদাররা এদের খাতির করে না, শস্তার মালের খাতির হয় না। আপনি যাই বলুন, আমার কিন্তু পছন্দ ওই ওদের, যাদের একজনকে আপনি একটু আগে দেখলেন। কেমন গায়ে গায়ে আছে, যা কিছু এখানে তৈরি হয়েছে বা তৈরি হচ্ছে তার সব কিছুতেই তারই হাত, সে-ই করেছে অথচ কোনও কিছুতেই তার কোনও দখল নেই। এ যেন সেই কবিতার মতো, খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।

আপনার তো বেশি এরকম লোক নেই বললেন?

আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমি চুনোপুঁটি, রুই-কাতলাদের একজনকেও আপনি চেনেন না। তাদের এইরকম লোকের আস্ত গ্রাম আছে।

তিনি বলে যান, আর একটু অন্যরকম ব্যবস্থা আছে। যাবেন নাকি ওদিকে? নিজের বাড়ির চৌহদ্দির পশ্চিম সীমায় এসে আনোয়ার সিকি মাইল দূরে একটা ছোটো পল্লির দিকে আঙুল তুলে দেখান। উঁচু উঁচু শাদা পোড়ো ভিটে দেখা যাচ্ছে। এ অঞ্চলের কিছু ধূলো-মাখা শাদা পাতাওয়ালা বেঁটে বেঁটে গাছ আর কিছু মাটির তৈরি খড়ো বাড়ি রয়েছে নজরে আসে।

ওখানে কী?

এখানে আমার ভাগচাষিরা থাকে। ওরা গেরস্থ, ভিটেটুকু ওদের নিজের। এক-আধ ছটাক জমিও আছে কারো কারো। নিজের হাল বলদ দুএকজনের আছে, বেশির ভাগ লোকেরই অবশ্য নেই।

সিকি মাইল উঁচু নীচু পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে না বেশি। আশ্চর্য নিস্তব্ধ পল্লি। কোনো মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। একটা বাড়ির পিছনের সারগাদার পাশে একদল ক্যাঁচকেঁচে পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। নির্জন দুপুর বেলায় সেই শব্দ প্রায় ভৌতিক মনে হয়। অনেকগুলো ভিটের উপর খড়োচাল মুখ থুবড়ে আছে, মানুষজন নেই। ভাঁট বা আশশ্যাওড়া জাতীয় গাছে উঠোন জঙ্গল হয়ে গেছে। গলির মতো উঁচু নীচু রাস্তা ধরে খানিকটা এগোতেই অবশ্য পরিচ্ছন্ন, তকতকে উঁচু এক খামার বাড়িতে এসে পৌঁছুনো গেল। লাল মাটির নিচু দেয়াল দিয়ে উত্তর দিকটা ঘেরা, পুবদিকে একটা খড়ো বাড়ির বাইরের দিকের দাওয়া। রাস্তাটি চলে গেছে পশ্চিম দিকে দু-পাশে সারি সারি মাটির বাড়ির ভিতর দিয়ে একটি গলি হিসেবে। খামারের এক কোণে নিপুণভাবে সাজানো উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত কাটারিভোগ ধানের একটি গাদা, তার পাশে সবুজ ছাতার মতো একটি আমগাছ। সেখানে শেষ শীতের দুপুরে এক কুচকুচে কালো কোকিল নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে। খামারের উপর খোলা আকাশের নীচে রোদের মধ্যে বছর চারেকের একটি ধুলোমাখা ন্যাংটো শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ সবুজ শাড়ি পরা ঘোমটা দেওয়া এক তরুণী শিশুটির পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। কাটারিভোগের ঘন গন্ধে বাতাস ভারি!

আনোয়ার এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। এইবার বললেন, এই সময়টার সারা গাঁয়ে একজন জোয়ান পুরুষকেও পাওয়া যাবে না জানি। তবু নিয়ে এলাম আপনাকে। সবাই মাঠে।

এরাই সব আপনার ভাগচাষি?

হ্যাঁ– তবে কেউ কেউ অন্য লোকেরও জমি করে বইকী।

আপনি কি ভাগচাষি বদলান?

না, শুধু শুধু বদলাতে যাব কেন?

তা বলছি না। ইচ্ছে করলে বদলাতে পারেন?

তা পারব না কেন? আমার খুশি, আমি দিলে তবে তো আমার জমি চষবে? না দিলে কী করবে আমার? জমির উপর বেশি চাপ পড়লে জমি নষ্ট হয়ে যায় বলে আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু জমি ফেলে রাখি।

তখন কী হয়?

কী আবার হবে? আমি অবশ্য যে জমি পেল না, তার একটা ব্যবস্থা করে দিই। না দিলে কী হবে? সে দায় তো জোতদারের নয়। আসলে আপনি অবস্থাটা ঠিক ধরতে পারছেন না।

না, ঠিক পারছি না কিন্তু।

এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে এক লোলচর্ম বৃদ্ধ বেরিয়ে আসে। তার সারা শরীরে পাঁচড়া। তার উপর চবচবে করে তেল মাখানো। সেই জ্যান্ত কঙ্কাল দেখে আমি দু পা পিছিয়ে যাই। লোকটি খুট খুট করে এগিয়ে এসে খামারে উঠে পড়ে, আমাদের দেখতে পায়, আমিও লোকটির ঘোলা চোখদুটি দেখে ফেলি। তার হাঁটার ধরন থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল আবছা কিছু একটা দেখেছে বা শুনেছে সে, হয়তো আমাদের দেহরেখা, কিছু ক্ষীণ শব্দ– কারণ সে এগিয়ে আসতে আসতে প্রায় আমাদের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

কবরেজ মশাই, আমাকে চিনতে পারছ না? আনোয়ার সাড়া দিলেন।

লোকটি দাঁড়িয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে, থুতনিটা ঝুলে পড়ে অনেকটা, ঘোলা চোখদুটি দিয়ে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে, অনেকক্ষণ, মুখের একটি রেখাতেও মানবিক কোনো কম্পন দেখা যায় না। শুধুই কিছু স্নায়বিক আক্ষেপ। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে দু-হাত জোড় করে আনোয়ারের দিকে ফিরে ঘাড় মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানায়, তারপর আমার দিকে ফিরে একই ভাবে সেলাম দিতে গিয়ে আর মাথা তুলতেই চায় না যেন।

লোকটির গা থেকে নানা রকম গাছগাছড়া, গন্ধক আর কীসব তেলের উৎকট গন্ধ আসছে।

এ কবিরাজ– এই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক লোক– আনোয়ার বললেন, তারপর লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন?

amarboi.com

চাপা, বসে-যাওয়া ঘষঘষে গলায় লোকটি বলল, ভালো নয়, কে খাতে দেবে, কোথা থেকে খাবার পাবু?

বোঝা গেল কবরেজ মশাইয়ের বলার মতো বিরাট গল্প আছে– কিন্তু আমি আর শুনতে চাই না।

আনোয়ারের দিকে ফিরে আমি বলি, চলুন।

গল্পের জায়গা জমি মানুষ

আমাদের দেশ ছিল রুখো কর্কশ। গাছপালা প্রায় নেই। খুব বড়ো বড়ো মাঠ। তেপান্তর যাকে বলে। গরমের দিনে ঘাস জ্বলে যায়। মাটির রং হয় পোড়া তামাটে। শরতে সেই মাটিকেই দেখি হাড়ের মতো শাদা। বর্ষায় কুচকুচে কালো মাটিও দেখেছি। তিন মাইল চার মাইল লম্বা মাঠ ন্যাড়া। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বিশাল বট বা অশথ দাঁড়িয়ে আছে। মহীরূহ। তাদের সবাই প্রায় শতাব্দী পেরিয়েছে। এদেরও অবশ্য নতুন প্রজন্ম আছে। কচি বট অশথ। কেউ তাদের গায়ে হাত না দিলে অবহেলায় শত বছর পরমায়ু পাবে। এইরকম বিরল কিছু গাছ বাদ দিলে খোলা মাঠে বনকুল, শেয়াকুল, ভয়ানক রাগী জাতের ফণিমনসা কিছু কিছু দেখা যায়, তাদের গায়ে তামাটে ধুলোর পুরু আস্তর, বোশেখ জষ্টির রোদে ওৎ-পাতা ভালুকের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

এই হলো রাঢ়। নির্দয় শুকনো কঠিন। আমাদের দেশ মধ্যরাঢ়। পশ্চিমে প্রাচীন মঙ্গলকোট। গায়ে আগাগোড়া পুরনোর ছাপ। মজা দিঘি, পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো ক্ষয় পাওয়া বটগাছ। পাতলা পাটালির মতো ইটে গাঁথা বাড়িঘর, দালান-কোঠা মাটির তলায় সেঁধিয়েছে। মঙ্গলকোটের গায়ে অজয় নদী শুকিয়ে গেছে। বছর পাঁচেক আগে শীতের এক সকালবেলায় বড়ো বড়ো দানার লাল বালি পার হয়ে অজয়ের হিম ঠান্ডা পানিতে নেমেছিলাম। পানি হাঁটুর উপর ওঠেনি। আমার তিনদিন স্নান হয়নি। ধূলোয় আগাগোড়া ঢাকা। বরফের মতো ঠান্ডা পানি আঁজলা ভরে নিয়ে মুখে ঝাপটা দিয়েছিলাম। ওপারে বোলপুরের বাস। সড়কের নিচে অজয়ের উঁচু পাড়ে তেলেভাজার দোকানো বারো-চোদ্দো বছরের একটি মেয়ে চমৎকার আলুর চপ ভেজে খাইয়েছিল মনে আছে। এমন আক্রার দিনেও ভারি শস্তা।

পুবে মালডাঙা। পুরনো জমি। দেশে জমির খুব অভাব– তাই লোকে আবাদ করে, নইলে এ জমি এমন পাথর, এমন কঠিন রসকষহীন যে আবাদ হত না। চারিদিকে উঁচু উঁচু টিলার মতো। প্রায় গিরিগোবর্ধন। খুবই পুরনো ডাঙা। নদী

নেই। যা আছে লোকে তাকে কাঁদর বলে। সরু সরু গভীর খাতের নালা। বর্ষায় তীব্র স্রোত হয়।

রাঢ়ের কথা মনে পড়লেই গরমকালের কথা আগে মনে পড়ে। মরুভূমির মতো। তীব্র শাদা কটকটে রোদে সব জ্বলে যায়। ধুলো ওড়ে। গাছপালা ঝোপঝাড় ধূলোয় ঢেকে যায়। জমিতে বড়ো বড়ো ফাটল দেখা দেয়। এই সব ফাটলে চোখ দিয়ে উবু হয়ে কতদিন অন্ধকার পাতালরাজ্য দেখতে চেয়েছি! গাছের ছায়ায় জিভ বের করে শেয়াল হাঁপাচ্ছে। বড়ো গাছের কোটর থেকে বা খোলা মাঠের কোনো গর্ত থেকে হঠাৎ খেঁকশিয়াল বেরিয়ে বিদ্যুৎতের বেগে ছুটে চলে গেছে। রোগা রোগা বেঁটে মেটে রঙের গরুর পাল রোদের মধ্যে খিদে তেষ্টায় পাগলের মতো ঘাস বা পানি খুঁজছে। শুকনো খড়ের মতো ঘাস ছিঁড়তে গেলে মাটি শুদ্ধ উঠে আসে। গরু ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে— মোলায়েম ধুলো উড়ে যায়। জোর হাওয়া ওঠে কখনো কখনো। ধূলোর গোল থাম আকাশে উঠে যায়।

এই দেশ যেন দুর্ভিক্ষ আর খিদের জন্যে তৈরি হয়েই আছে। কারণ এখানে মানুষও বাস করে। পোড়া কালো রঙের পাকানো পেশি বের-করা মানুষ— রাঢ়ের মানুষ— এই রাঢ়ীয় প্রকৃতিতে বসবাস করে। বরং বলা চলে বাংলাদেশের বহু অংশের চেয়ে অনেক কাল আগে থেকেই এই অঞ্চলে এরা জীবনযাপন করে আসছে। এ-কথার যদি কেউ প্রমাণ চান, তাঁকে ভূতত্ত্ববিদের কাছে যেতে হবে না, নৃতাত্ত্বিকের দ্বারস্থ হবারও প্রয়োজন নেই। রাঢ়ের কিছু গ্রাম ঘুরে এলেই হয়। জনপদ যাকে বলে। এমন গ্রাম বাংলাদেশের নতুন-জাগা অঞ্চলে দেখিনি। বড়ো বড়ো গ্রাম শহরের মতো সাজানো। চওড়া সড়ক। দু-পাশে টিনের বা খড়ের চালের বাড়ির পর বাড়ি। মাটির বাড়ি স্বচ্ছন্দে একশো বছর পেরিয়ে যায়। জীবন চলে ধিকিয়ে ধিকিয়ে, শত শত বছরেও বদলায়নি, ইংরেজ চলে যাবার পরেও তেমন নয়। চাষ-বাসের সাজ-সরঞ্জামে প্রায় কোনো পরিবর্তন নেই। কিছু কিছু ক্যানাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে— নতুন নতুন সার ব্যবহার হচ্ছে আর কিছু নতুন ফসল। এ ছাড়া আর সব বাঁধা ব্যবস্থা। চাষবাস— সারা বছরের সব কিছু জন্মানো বা মরে যাওয়া, বিয়ে বা পালাপার্বণ। এই অঞ্চলে যখন মার্টিন কোম্পানির ছোটোলাইন বসে— ম্যাটমেটে লাল রঙের ট্রেন যখন টিক টিক খচো খচো শব্দে চলতে শুরু করে— তার আগে কেমন ছিল এদিকটা, আমি আন্দাজ করতে পারি। শুনেছি তেপান্তরের মাঠে, মজা দিঘির পাড়ে ঝুপসি বটতলায় ঠ্যাঙাড়ের দল বসে থাকত। ঠ্যাঙাড়ে বলা হত না, বলা হত মামাভাগ্নের দল।

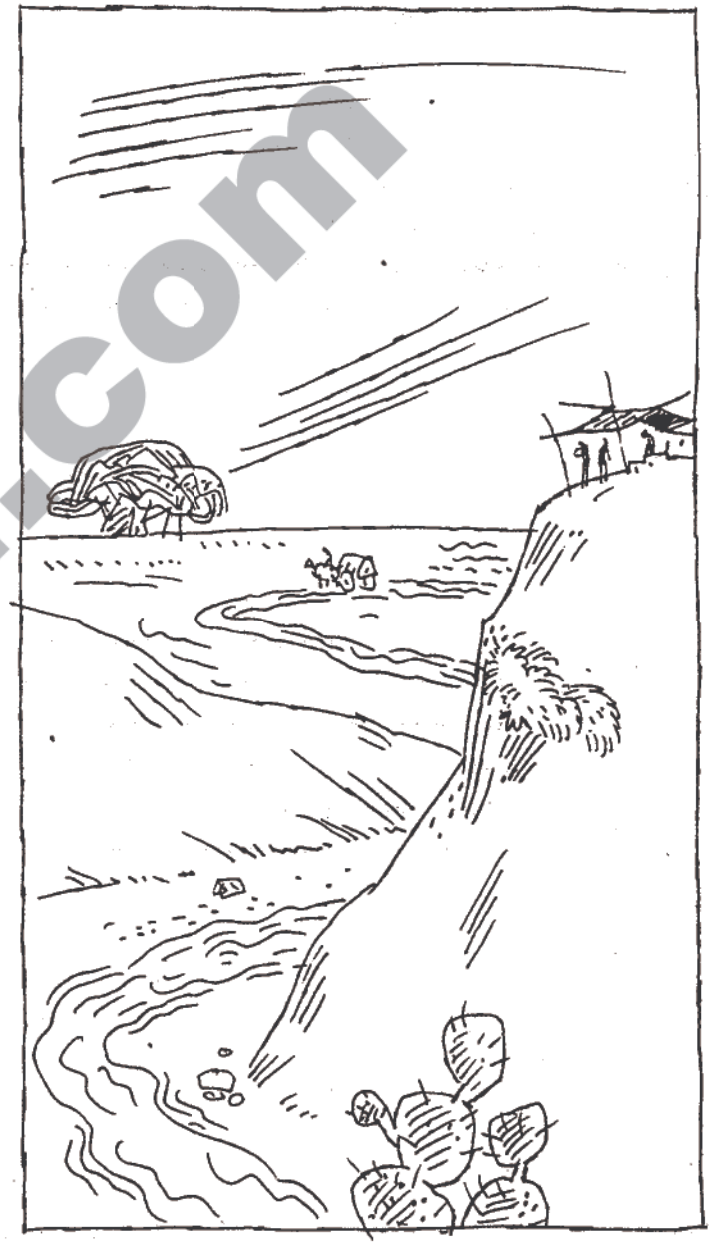

amarboi.com

তাদের কীর্তি বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। আজকেও দেশের দিকে তাকিয়ে এই ব্যাপার খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। যাই হোক, ছোটো লাইনের ট্রেন নিয়ে হয়তো যথেষ্ট কাব্যি করা চলে, কিন্তু বলতেই হয়, খানিকটা গতি এসেছিল বইকী মানুষের জীবনে। মাল আনা-নেওয়ার সুরাহা, লোক চলাচলের খানিকটা সুবিধে হয়েছিল। তবে এই সময় থেকেই গাঁয়ের দুধ ঘি শহরের দিকে চলে যেতে থাকে। মনে পড়ে, ট্রেনের একটা বেশ বড়ো কম্পার্টমেন্টের গায়ে লেখা ভেন্ডর– আশেপাশের গাঁয়ের তাবৎ গোয়ালা পিতল কাঁসার ঘড়ায় দুধ ভরে খেজুরের পাতা চুবিয়ে দিয়ে হতাশ বোকাটে চোখে ঘড়ায় হাত দিয়ে বসে আছে।

রাঢ়ে খুব ফসল ফলে। কিন্তু তার জন্যে যে পরিশ্রম করতে হয় তা কল্পনা করাও কঠিন। রাঢ়ের চাষিদের চেয়ে বেশি শরীরের শ্রম খরচ করতে আমি আর কোথাও দেখিনি। বারকতক চেষ্টা করে হয়তো দেখা গেল লাঙলের ফাল মাটিতে কিছুতেই বসছে না। যেমন তেমন লাঙল নয়– মোষের লাঙল। প্রায় এক হাত লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া ফাল। শুকনো জমি চষে চষে রুপোর মতো শাদা। মোষও তেমনি, ছোটোখাটো হাতির মতো। দু-জাতের মোষের ব্যবহার হয়। হিরণপুরের মোষ– পাতলা ছিপছিপে গড়নের, পাগুলো সরু সরু, খুর ছোটো, বড়ো বাঁকানো শিং। আফ্রিকার বুনো মোষের মতো দেখতে হয়। আসলে এগুলোই বুনো। গেরস্থের বাড়িতে আসার পর এরা পুরুষত্ব হারায়। অত্যন্ত ছটফটে, একগুঁয়ে, তেজি জাতের এগুলো। পাঁচন্দীতে পাওয়া যেত বিশাল শরীর, ঢিলে-ঢালা গড়নের মোষ– ছোটো শিং, মোটা মোটা পা আর ধ্যাবড়া খুর। খুবই ধীর-স্থির, মন্থরগতি, কিন্তু অসম্ভব বলবান। এইরকম মোষের লাঙলও কোনো কোনো জমিতে বসতে চায় না। তখন রাঢ়ের শীর্ণ চাষির হাতে ওঠে গাঁইতি। মাটির এক একটি চাঙড় ওঠে বিরাট ওজনের। সেই চাঙড় গুঁড়নো আর রেল রাস্তার কালো পাথর ভাঙার মধ্যে তফাত নেই কোনো। এইরকম করে জমি তৈরি করা। ধূলোর আর কাদার চাষের জন্যে আলাদা লাঙল ব্যবহারের ব্যবস্থা। বর্ষা এলে চারা তুলে জমিতে রোয়া। পিঠে আষাঢ়ের বৃষ্টি বা রোদ। দুটোই সমান সাংঘাতিক। আর সেই লোহার তারের মতো লালচে রঙের ঘাস। এর পর ধান কেটে আঁটি বাঁধা ; একটি একটি আঁটি জোগাড় করে ঢিপি তৈরি করা। শিল্পীর মতো দরদের সঙ্গে। মোষের গাড়ি বোঝাই, আবার একটি একটি করে আঁটি আছড়ে ধান বের করা। সংবৎসরের অন্তহীন অকথ্য পরিশ্রমের কাজ। আজ এসবের কোথাও বিজ্ঞান ঢোকেনি এক ফোঁটা। এইরকম কষ্ট বা

তারও বেশি অন্য ফসলের বেলায়। আলু, গম, পেঁয়াজ, আখ। প্রতিটি ফসলের জন্যে মাটির কাছে রাঢ়ের চাষি মাথা কোটে।

কিন্তু এই পরিশ্রম কার জন্যে? সব হিসেব ভন্ডুল হয়ে যায় এইখানে এসে। রাঢ়ের একটা এলাকার কথা বলতে পারি। বড়ো চাষি– যাকে জমিদার বা জোতদার বলা যায়– তেমন খুব বেশি নেই এই এলাকায়। একটা গ্রামে একশো বিঘে বা তার বেশি জমির মালিক দু-চারজনই। অধিকাংশই মাঝারি কৃষক– দশ থেকে পনেরো বিঘের মধ্যেই এদের জমি। তবে দু-তিন বিঘে থেকে শুরু করে আট-দশ বিঘের মালিক এমন গৃহস্থের সংখ্যাই বেশি। ভিটেটুকু বাদ দিয়ে একটুকরোও জমি নেই তেমন লোকও অনেক আছে। মজা দেখতে পাই গত বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে। জমির উপর কেবলই সরু সরু আল উঠছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে জমি। পঙ্গপালের মতো লোক বাড়ছে। নতুন মুখ খাবারের জন্যে আকাশে এক ঠোঁট পাতালে এক ঠোঁট নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। আর জমি কেবলই ভাগ হচ্ছে। ভিটে ভাগাভাগি হওয়ায় বসতবাড়ি খণ্ড খণ্ড। থাকার ঘরের পরিসর কমে আসছে। বড়ো বড়ো মাঠ-কোঠার বদলে আট হাত বাই দশহাত খুপরি– দশ-পনেরো বছরের মধ্যে এক-একটা গ্রামের গৃহবিন্যাস একেবারে বদলে অন্যরকম। ফলে গ্রামসংলগ্ন জোরালো জমির উপর বসতবাড়ি তৈরি হয়ে গাঁ আকারে বেড়ে যাচ্ছে। যেহেতু কোথাও কোনো যৌথ উদ্যোগ নেই– থাকার কথাও নয় অবশ্যি– প্রতিটি পুরুষ মানুষ আপন স্ত্রী আর একগাদা অপোগন্ড নিয়ে স্রেফ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে গলায় গলায় ডুবে আছে। বছর চারেক আগে এক জমায়েতে আমি গুনে দেখি আমাদের পাড়ায় মোট পুরুষ মানুষ কুল্লে একশো– কিন্তু পাশে যে বাচ্চার দল কিলবিল করছিল তা গোনার চেষ্টা করতে আমার সাহস হয়নি। জ্যালজেলে কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ওদের ধনুকের মতো বাঁকা সরু মাংসহীন ঠ্যাংগুলো আমার নজরে আসে। এদের মধ্যে যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সবই ছিল। উৎসবের দিন বলে সকলেই সাধ্যমতো ক্ষারে কাচা হাফশার্ট ইত্যাদি পরে এসেছে– জবজবে করে তেলও মেখেছে। এক-এক করে এদের সকলের মুখের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ ঝলকের মতো একটা প্রায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আমার হয়ে যায়। উপলব্ধিটা হলো : এদের কেউই মানুষের জীবন কাটাল না। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা তোলা তো ইয়ার্কি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না– পশুর সঙ্গে মানুষের জীবনের যদি কোথাও কোনো ভেদরেখা থেকে থাকে, সেটা এদের কাছে একেবারে লেপেমুছে গেছে। উচ্চ, মধ্য, প্রাথমিক সবরকম শিক্ষার দরজাই এদের জন্যে বন্ধ, তা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকই হোক আর মাগনাই হোক।

মানুষের জন্ম হলেই বাঁচার একটা যন্ত্র সে বিনা পয়সায় পেয়ে যায়— এই হিশেবেই এরা বেঁচে থাকে। তবে কতদিন যন্ত্রটা চলবে তা কেউ জানে না। বিকল হলে প্রকৃতি দয়া করে দিন কতকের জন্যে মেরামত করে দিল তো চলল— না হলে গেল বন্ধ হয়ে। চিকিৎসার ব্যাপার হচ্ছে এই। ব্যতিক্রম যা আছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাঢ়ের চাষির ঘরের ছেলের ছাতি আঠারো বিশ বছর বয়সে একবার প্রকৃতির নিয়মে ফুলে ওঠে। দেখবার মতোও হয়। তিরিশ থেকে চুল পাকতে থাকে, দাঁত আলগা হয়ে যায়, শরীরের খাঁচা বেরিয়ে পড়ে— চল্লিশের কাছে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। যন্ত্র আর চলবে না। পৃথিবীতে খাদ্য আছে, বস্ত্র আছে, বিচিত্র ঘরবাড়ি আছে, মানুষের হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আছে, বিপুল মানস-সম্পদ, বিত্ত আর বৈষয়িকতা আছে, বিজ্ঞান আছে। রাঢ় তা জানে না। ট্রানজিস্টরে খবর আসে— উন্নয়নের কথাবার্তা হয়, চাষের উন্নতির জন্যে শলা পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছুই যায় আসে না। এইরকম দেখেছি। মনে আছে ১৯৪৭-৪৮-এর দিকে আমাদের পাড়ায় পাঁচজন বাদ দিয়ে সবাই ম্যালেরিয়ায় কাত হলো। গ্রামের একমাত্র অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার চাষবাস বাদ দিয়ে ইয়া মোটা সূচের সিরিঞ্জে কুইনাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে দু-পয়সা কামাতে শুরু করেন। তাঁর পসার দেখে অসহায় হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশন রপ্ত করতে গিয়ে একজন রোগীর জীবন বিপন্ন করে সূচ ভেঙে ফেলেন। আমি দেখেছি। শেষে হলুদ মেটে রঙের বড়ি আসে স্কুলের মাস্টার-মশাইয়ের কাছে। কুইনাইন আর ম্যাপাক্রিন। তাই খেয়ে ম্যালেরিয়া সারে— কিন্তু পিলে বেরিয়ে আসে— কান ভোঁ ভোঁ করে— আফিংখোরের মতো সবাইকে বাধ্য হয়ে এক ঢোঁক করে দুধ খেতেই হয়। এই সময়ে আবার কাপড় কেরোসিন চিনি নেই। চটের মতো মোটা মিলের শাড়ি পাবার জন্যে কন্ট্রোলের দোকানে মানুষ সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে।

উদয়াস্ত অকহতব্য পরিশ্রম দিয়ে রাঢ়ের মানুষ এইসব পেয়ে আসছে। জমিদার, জোতদারের বিশেষ অত্যাচারের কোনো ব্যাপার নেই— সমাজের বিন্যাসটাই এমন যে কিছুই বদলাবার জো নেই। জোড়াতালির সেলাই কোথাও চোখে পড়বে না। চিৎকার হল্লা করে প্রতিবাদ জানাবার তেমন উপলক্ষ নেই। কারণ, এমন তো কেউ অত্যাচার করছে না যাকে আঙুল দিয়ে দেখানো চলে। লোক বাড়ছে— তাতে কার কী দোষ? শরিক বাড়ছে জমি ভাগ হচ্ছে, বসত বাড়ি ছোটো হয়ে যাচ্ছে, পুকুর হাতছাড়া হচ্ছে, গোয়াল থেকে গরু অদৃশ্য হচ্ছে, নিজের হালবলদ চলে যাচ্ছে, জমির চাপান নষ্ট হয়ে ফসল কমছে— শুয়োরের মতো গোঁ নিয়ে দিনরাত খেটেও যে ফসল পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা জোটানো সম্ভব হচ্ছে না। সবই সত্যি। কিন্তু দোষ কার? এতে যদি খেতমজুর বাড়ে, অন্যের জমি ভাগে চষতে হয়, সেজন্যে কাউকে তো অপরাধী করা যায় না। এ ঠিক নাগরদোলার ঘূর্ণির মতো— ফিরে ফিরে একই জায়গায় এসে দাঁড়ানো।

এই হচ্ছে চিরায়ত রাঢ়। একটু টেনে কথাটা বললে চিরায়ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের কথা বলতে গেলেই আমাদের ভদ্রলোকেরা লাফ দিয়ে টুলের উপর দাঁড়িয়ে গলা কাঁপিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলেন, আমাদের অতি প্রাচীন ঐতিহ্য— বাঙালিদের একটা চিরায়ত সংস্কৃতি, একটা ইয়ে— একটা ইয়ে আছে। ইয়ে আছে তা আমি অস্বীকার করতে পারব না— তবে সেটা ওই রকম। তবু এই নিয়ে শহুরে শিক্ষিত মাঝারি ভদ্রলোকেরা করেন ভণ্ডামি— চোখে তাঁদের সামান্য বাষ্প আসে আর উপরতলার ওঁরা করেন রাজনীতি। রাঢ়ের চাষির জীবনের একটি ধ্রুপদী গৎ এইখানে আমি বয়ান করি।

হানু শেখ— জন্ম ১৯২০। বাপ মরার সময় পনেরো বিঘে জমি, একটি বিধবা আর চারটি অপোগণ্ড ভাই রেখে গেছে। হানু শেখ ভাই কটিকে পাঠশালে দিয়ে সংসারের জোয়াল ঘাড়ে নিল। নিজে সে বিয়ে করবে না— ছোটো চার ভাইয়ের বড়োভাই রামচন্দ্র হয়ে থাকবে। পাড়ার লোকে ধরে শেষ পর্যন্ত হানু শেখের বিয়ে দিয়ে দেয় অবশ্যি। এর বছর পনেরো পরের কথা। পাঁচ ভাইয়ের সচ্ছল সংসার। সব কটি ভাইয়ের ছাতি ফুলেছে। বাপের রেখে যাওয়া জমি কিছুটা বেড়ে গেছে পর্যন্ত। হানু শেখ নিজে হাটে গিয়ে একজোড়া মোষ কিনে এনে তাদের পায়ের খুর থেকে শিং পর্যন্ত আগাগোড়া তেল মাখিয়ে গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে পাড়ার লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে, দ্যাখো তো বাপু, মোষ দুটো কেনলোম, কেমন হঁইছে?

এরপর জোরজার করে একে একে তিন ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া হলো। কিছুতেই তারা বিয়ে করবে না, সংসার ভেঙে যাবে। তবু বিয়ে হয়ে গেল। ছোটো ভাই কিছুতেই রাজি না— শেষে বিয়ের দিন হানু নিজে ভিনপাড়া গিয়ে ভাইকে খুঁজে বের করে তার কানের উপর চড় লাগিয়ে বলল, বিয়ে করবি না— শালা, বিয়ে তোকে করতেই হবে। হলো বিয়ে।

১৯৬০ সালে হানু শেখের বাড়ি ঢোকা দায়। কালো কালো নানা আকারের মানব কিলবিল করছে। পাঁচ ভাগে খণ্ডিত বসত-বাড়িতে পা রাখার জায়গা নেই। এক-এক ভাই দুই থেকে চার বিঘে জমি ভাগে পেয়েছে। সে জমিও দ্রুত চলে যাচ্ছে ভাঁটার স্রোতের মতো। কারো ছেলেমেয়ে পাঠশালা যায় না। এ-বাড়ি

amarboi.com

ও-বাড়ি গরুটরু চরায়। হানু শেখের একটি অঙ্গ পড়ে গেছে। বালিশে কনুই, ভাঙা নড়বড়ে হানু, চকচকে কালো চোখ– হানু শেখ বলে, বেলাড পেশার।

রাঢ়ের মানুষের দুর্গতি বর্ণনার জন্যে এ লেখা নয়। করতে চাইলেই বা কে পারবে তা করতে? শতকরা একশো জনের অবস্থাও অবশ্যি এরকম নয়। তবে ছবিটা মোটের উপর এইরকম। সমাজের বাস্তবতার এই রং, এই চেহারা। হ্যাঁ, এর মধ্যেই মানুষ। এই বাস্তবতার মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে। আনন্দ স্ফূর্তি করে– ভালোবাসে, আতিথ্য, দয়া, ধর্ম আছে, রাগে ফোঁসে, হতাশায় ভাঙে, আশায় নৃত্য করে, প্রতিবেশীর মাথা ফাটায়, মানুষকে বুকে টানে! সবই করে। কে অস্বীকার করবে তা? চিরায়ত কিছু থাকলে তা এই মানুষের ব্যাপার। মানুষ বাঁচে বলেই মন্দির মসজিদ তৈরি করে। হাত আছে, জ্যান্ত হাত, কাজ হয়– তাই হাতের কাজে নৈপুণ্য আসে, দক্ষতা দেখা দেয়, মন্দির মসজিদের গায়ে সৌন্দর্য ফোটে, গলায় ফোটে গান। মেকি গান নয়, খোলা মাঠের উপযোগী, যে গানের সুর জমি চাষের, ধান কাটার, শস্য মাড়াইয়ের সঙ্গে মেলে। শিশু জন্মায়, তাদের ভোলাতে নতুন খেলনা লাগে। ব্যবহারের জিনিশে উপযোগিতা সৌন্দর্য দুটোই আস্তে আস্তে দেখা দেয়। এইসব নিয়েই তো সংস্কৃতি। এই বিকাশেরও একটি ধারাবাহিকতা আছে বই কী– বিকাশের সাধারণ নিয়ম কানুনও আছে। তাই যতো পুরনো দেশ– তত পুরনো সংস্কৃতি।

আমার লেখার এই হলো জায়গা জমি মানুষ। এইসব বর্ণনা করাই কি শিল্প? যেমন আছে, তেমনি তেমনি নগদ বর্ণনা? তা মনে হয় না। তবে এই হচ্ছে ভিত্তি। এটা জানা থাকলে দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবনের কাঠামো জানা হয়ে যায়। কিন্তু মানতেই হবে এই জানার সঙ্গে সাহিত্য শিল্পের কাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব স্পষ্ট হয় না। স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুধু শিল্পের স্থাপনা ও তার পাদপীঠ। পাদপীঠের সঙ্গে বাঁধা মানুষ– শেষ পর্যন্ত যা ব্যক্তি– সেই ব্যক্তি আর তার অতি প্রাচীন বিকাশের অতীত, সংস্কারে, বিশ্বাসে, প্রাত্যহিকতায়, জীবনের সংগ্রামে ও ভালোবাসায় যার প্রকাশ– এমন ব্যক্তি এবং যৌথ জীবন জটিল ধাঁধার মতো শিল্পের জগতে প্রবেশ করে। সাহিত্য শিল্পের ব্যাপার তখন যেন আলাদা হয়ে ওঠে। সাহিত্যে শিল্পী আত্মপ্রকাশেরই চেষ্টা করেন বটে। তবে শিল্পী নিছক ব্যক্তি হিশেবে নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাঁধা তাঁর স্বতন্ত্র জগতেরই প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন তিনি। পাঁচজন বন্ধু নিয়ে যাঁর জগৎ তিনি যেভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেন, একা থেকে বাল্যের কৈশোরের স্বপ্নে যিনি বুঁদ থাকেন, তিনি সেভাবে করেন না। এ জন্যেই মনে হয়, শিল্পী নিজেকে ছড়াতে

পারলেই ভালো। তাতে হয় কী তিনি এমন জরুরি কথা তুলতে পারেন যার সঙ্গে বহু মানুষের যোগ! যিনি বহুদূর ডালপালা মেলতে পারেন, তিনি তাঁর কালের সবচেয়ে দরকারি কথাগুলো বলে ফেলতে পারেন। অফুরান জীবনের রস তিনি অফুরানভাবে পরিবেশন করতে পারেন।

এমন যে কঠিন কর্কশ দুঃখময় রাঢ়– ভাবতে গেলে অনেক কথাই আর মনে থাকে না। আমার কাছে রাঢ় তাই কখনো শীতরাত্রির হিমকালো আকাশ। বিশাল প্রান্তরের উপরে যেন বিশালতর ঢাকনা। তার ঝকঝকে তারা, তারাদের অস্পষ্ট চাপা আলো। খোলা মাঠের একদিকের বহুদূরের গ্রাম থেকে স্পষ্ট ভেসে-আসা জমকালো চিৎকার, ওরে দেখে লে জনমের মতো ; নিস্তব্ধতা ; শেয়ালের হাঁক, বাচ্চাগুলোর শেষ হুয়া হুয়া হুকিউ-উ চিৎকারটি পর্যন্ত। রাঢ় হচ্ছে ধান কেটে নিয়ে যাবার পর জমির নাড়া, চৈত্র মাসের শুকনো এলমেলো বাতাস, শাদা ধুলো। এইভাবে এখন আমি রাঢ় গড়ে তুলি– কামারশালে গনগনে আগুন জ্বলে, মাঠের পানি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মানুষের মাথা ফাটে, জ্বরের ঘোরে কোঁকাতে কোঁকাতে মানুষ ইয়ার্কি করে, জমিতে কাজ করতে গিয়ে মোষের আর মানুষের জিভ বেরিয়ে যায়, মানুষ রক্তমুখী হয়ে ওঠে, ভয়ানক স্বার্থ নীল বিষ ওগরায়, হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষে, মুসলমান হিন্দুকে পছন্দ করে না– সাময়িকভাবে মানুষ হারিয়ে যায়। আবার গলায় গলায় মানুষ ফিরে আসে। হুঁকো থেকে কলকেটি খুলে নিয়ে মানুষকে দেয়। এই রাঢ়। কাদায় গোটা মোষ ডুবে গিয়ে শিরদাঁড়াটি মাত্র কালো চাবুকের মতো বেরিয়ে থাকে, উলঙ্গ মানুষ কাদা মেখে মাঠের ডোবায় মাছ খোঁজে, জমিতে শস্য কুড়োয়, মেয়েরা ঘর নিকোয়, সন্ধেবেলায় দাওয়ায় তার পুরুষমানুষকে গুড় মুড়ি পেঁয়াজ খেতে দেয়, কঠিন শক্ত হাতে চাষি তার ঘরনিকে বুকে টেনে পেষে।

তবে শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষকে পাইয়ে দেয়। সমগ্র তৈরি হয় এইভাবেই।

আমার পক্ষে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। প্রায় নবজন্ম। রাঢ় থেকে যা পাই, দক্ষিণবাংলার নাবি অঞ্চলে এসে তা হারাই না। দুটি ব্যাপার ঘটতে থাকে : রাঢ়কে নতুন করে পেতে শুরু করি আর একই সঙ্গে আমার গল্পের জায়গা জমি বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে দক্ষিণবাংলা গ্রাস করে ফেলে প্রায়। এবং আমি নিজেও গ্রাসিত হই। এই ব্যাপারটা কঠিন হয়েছিল আমার পক্ষে। নতুন করে মনজোড়া। বুকজোড়া। দেশ দখলের কাজ কঠিন সন্দেহ কী? তবু মানুষের কল্যাণে তাও সম্ভব হয়ে যায়। সময় এলে আবার কখনো সেই কথা বলা যাবে।

আবার যদি ইচ্ছা করো

ভূগোলটা আগেই জানিয়ে রাখি। বর্ধমান-কাটোয়া ছোটো লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় নিগন ; স্টেশন থেকে সিধে পূবমুখো সড়ক। সড়কটা সিধে নয়– বরং একটু বেশিই আঁকাবাঁকা, খানিকটা এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসতে হয়, কোথাও 'দ'-এর মতো, কোথাও বা বাংলাদেশের মানচিত্রের নীচের দিকটার মতো। ধূলোভর্তি সড়ক। মোরাম দেওয়া হয়েছিল– তার চিহ্ন কিছু দেখতে পাচ্ছি এখনও। কিন্তু রাঢ়ের ফাঁকা মাঠের হুহু হাওয়ায়, বৃষ্টির তোড়ে, গরু-মোষের পায়ে পায়ে, গাড়ির চাকায় চাকায় লাল মোরাম ধুয়ে-মুছে সাফ। ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে এই অঞ্চলের মূল শাদা শক্ত এঁটেল মাটি। এই সড়ক ধরে আমাকে দু-মাইল যেতে হবে। মাঝখানে আর কোনও গাঁ নেই। একেবারে সেই এক ক্রোশ গিয়ে তবে আমার গ্রাম যবগ্রাম। দু-পাশেও, বাঁ-পাশে ডান পাশে দু-তিন মাইলের মধ্যে কোনও জনপদের ঠিকানা নেই। মোট কথা সড়কের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াতে একেবারে দিশেহারা। মাথার উপরে শীতকালের দুপুরবেলার নীল আকাশ, বিরাট একটা খালি পেয়ালার মতো উপুড় হয়ে আছে। বহুদূরে আশেপাশের গাঁ-গুলির হালকা রেখামাত্র দেখা যায়। ধান কেটে নিয়ে জমি শূন্য– এত সমতল যেন পেটানো ছাদ, যেন ফুটবল খেলার মাঠ। হঠাৎই একটা হুহু হাওয়া উঠল। কী রকম যে করে উঠল বুকের মধ্যে! হুহু করে উঠল হাওয়া নয়, হুহু করে উঠল বুকের ভিতরের ফাঁকা জায়গাটায়। হাওয়া তো সেখানেও ওঠে!

ফিরছি বহু বছর পরে। সেই কবে এখান থেকে, আমার জন্মের জায়গা, আমার বেড়ে ওঠার জায়গা যবগ্রাম থেকে চলে গিয়েছি তিরিশ বছর আগে। তারপর কখনও-কখনও এসেছি বটে, কিন্তু সেই আমার সত্যি করে চলে যাওয়া। তিরিশ বছর আগে। তারপরে জীবনের দারুণ অন্যমনস্কতা– মোটা মোটা বিস্মৃতির আস্তর, বাঁচার জন্যে, সংসারের জন্যে কেবলই ধূলোমাখা, চোখের কোণে কালি জমানো আর কেবলই কপালে, গালে, ভুরুর মাঝখানে চুলের মতো সরু সরু রেখা বুনে যাওয়া। এই তো ঘটেছে এতকাল। এখন তিরিশ বছর পরে

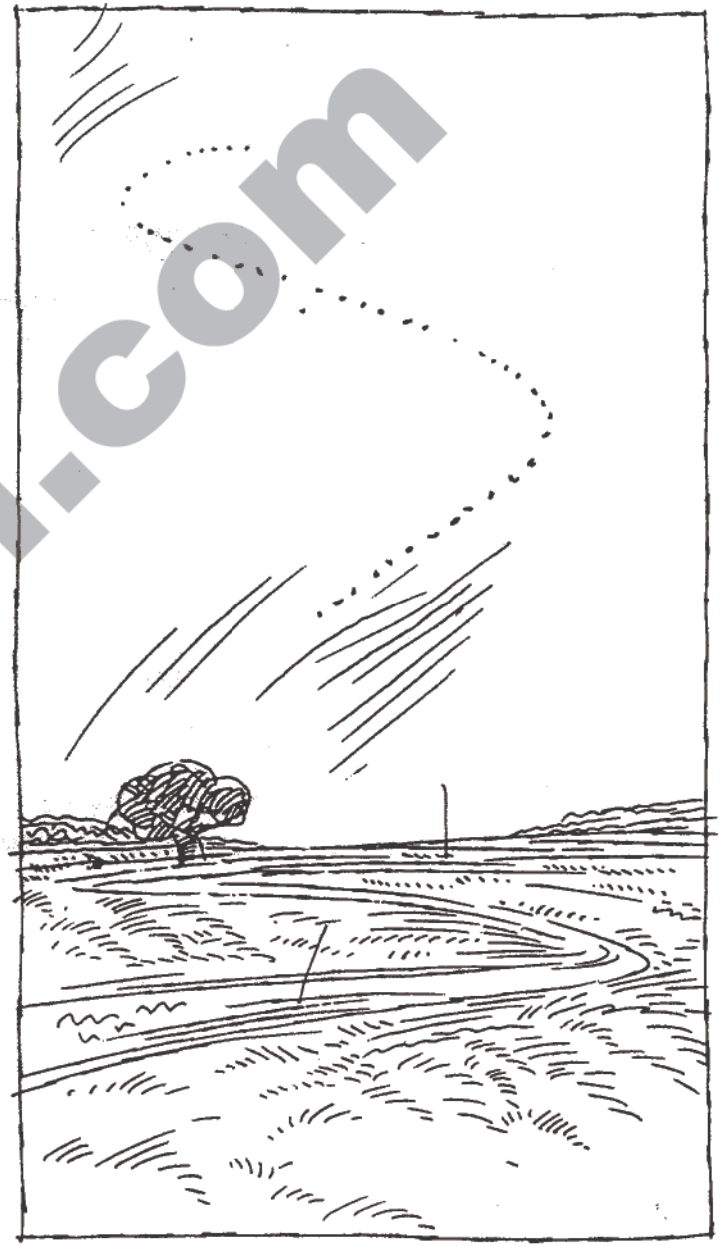

amarboi.com

রাঢ়ের এই শাদা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নরম নীল আকাশের দিকে চেয়ে 'বড়ো আশা করে ...বড়ো আশা ...এসেছি গো ...ফিরায়ো না, জননী...' মনে মনেও যে গাইতে পারিনে! কী আপদ, দুই চোখ জলে ভরা, বুকের মধ্যে মুগুরের বাড়ি, গলার ভিতর গরম কাপড় গোঁজা। থরথর করে কাঁপতে থাকা দুই ঠোঁটে হাসি।

এই অসম্ভব ভাবপ্রবণ লেখা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। পাঠকের পক্ষে এমন লেখা পড়াও দুর্ঘট। তাঁদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি শুধু এইটুকু বলে যে আমি বহুকাল বাদে আমার গাঁয়ে ঢুকছি! এটা যে প্রবেশের মুহূর্ত! আমি যে এখনও জানিনে, সব কিছু আপনা-আপনি আমার কাছে দেখা দেবে, না, আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে, নাকি এমনও হবে যে, আমি খুঁজে খুঁজেও কিছু পাব না।

আজ সকালে বেরিয়েছি কলগনার কাছে পাটনা গাঁ থেকে। পাটনায় পৌঁছেছি গতকালের আগের রাতে। বর্ধমান থেকে বাসে উঠেছিলাম। অন্ধকারের মধ্যে বাস ছুটেছে, শীতের ভয়ে গাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ। কিছু দেখাও যায়নি, দেখার চেষ্টাও করিনি। শুয়ুনদিঘির পরিত্যক্ত ডাকবাংলোর কাছে বাস থেকে নামিয়ে দেবার পর পাটনা গাঁ যে কোন্‌দিকে তা আর কিছুতেই ঠাহর করতে পারি না। রাঢ়ের অন্ধকার মাঠ আমাকে চিরদিন ভুগিয়েছে। শেষে শোনপাপড়ি বেচে খায় এক হতভাগা আমাকে প্রায় হাত ধরে আমার শ্বশুরবাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেল! রাত তখন ন-টা— কনকনে ঠান্ডা-মেশা জমাট নিস্তব্ধতা সমস্ত গাঁ জুড়ে। চিৎকার, ডাকাডাকি, দরজার ধাক্কাধাক্কি— কিছুতেই কিছু হয় না। মনে পড়ে গেল এমনি শীতের রাতে নতুনদার জন্যে মুড়ি কিনতে গিয়ে শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথ এক ঘণ্টা চেষ্টার পর গলা ভেঙে ফিরে এসেছিল। তবে কপালে অতটা কষ্ট ছিল না— দরজা খুলে যায়, ঘুমচোখে আত্মীয়রা বেরিয়ে এসে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপরেই সে কী হুলস্থুল। অত রাতে বাড়ি জেগে উঠে পাড়াটাকেই জাগিয়ে দেয়। শালী এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে পা থেকে জুতো খুলে নেয়। গরম পানি আর 'ছিলিমচি' নিয়ে এসে ঘরের ভিতরেই হাত ধুইয়ে দেয়। কিরকম অদ্ভুত যে লাগে! সমস্ত পৃথিবীর কোথাও কি এই অদ্ভুত ব্যাপার আছে? পা থেকে জুতো খুলে নেওয়া? আমি দূরে গেছি, না ওরা দূরে গেছে? না কি ওরা যেখানে ছিল সেখানেই আছে ; আমিই বিনা কারণে ক'জনের সঙ্গে হেঁটে দূরে চলে গেছি? এত দূরে যে যোগাযোগ হবার উপায় নেই। উপায় আমার হয়তো নেই, ওদের এখনও আছে। ওদের সেই উপায়ের নাম অবোধ ভালোবাসা। নতুন বিয়োনো গাই-এর ভালোবাসার

মতো— মানে-টানে কিছু নেই। আমার বয়েস যখন ষোলো বছর ছিল, মনে আছে, আমার এক আসন্ন-প্রসবা মাসি জোর করে আমাকে কোলে নিয়েছিল। বলেছিল একটা অদ্ভুত কথা, বাবা, তোকে একবার কোলে না নিলে আমি বাঁচব না। কী জানি হয়তো তাই— বাঁচবে না। আমার এই শালীও তো আমাকে ছাড়বে না— হয়তো কান ধরে টানবে, না হয় খেতে বসার পিঁড়ির নীচে আস্ত সুপারি দিয়ে রাখবে। সন্দেহ হয়, সবটাই প্রথা মেনে যাওয়া নয় তো? প্রথার যে আবার মৃত্যু নেই। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, রীতি প্রথা যদি খারাপই হবে, এতকাল তা হলে থাকবে কেন? বিদঘুটে যুক্তি সন্দেহ কী?

রাতটা গাঁয়ে কাটিয়ে গতকাল সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। আমি বেছে বেছে দুর্গম জায়গাগুলোতেই যেতে চাই। অবাক হয়ে শুনি, নানাদিকে ছড়ানো আমি যে পাঁচটি গাঁয়ে যেতে চাই, আজকের মধ্যেই তাদের প্রত্যেকটিতে যাওয়া সম্ভব। চতুর্দিকে রাস্তা চলে গেছে, নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, পুরনো রাস্তায় পিচ হয়েছে, বা মোরাম দিয়ে মোড়া হয়েছে। বেশির ভাগ রাস্তাতেই বাস চলে ঘনঘন। কলগনা নামের ওই ছোট্ট গঞ্জটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের কত জায়গার যে সরাসরি যোগাযোগ হয়ে গেছে তার হিশেব নেই।

গাঁ থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পাই সমতল রাঢ়ের বুক চিরে নানা দিকে লাল মোরাম-মোড়া উঁচু উঁচু রাস্তা চলে গেছে। বাস, রিকশা, না হয় ভ্যান, না হয় ছই-দেওয়া রিকশা— কিছু না কিছু সব রাস্তাতেই চলছে। সত্যি, এই একটি কাণ্ড পশ্চিমবঙ্গে অবাক করে দেবার মতো। যোগাযোগ আর বিদ্যুৎ-সংযোগ। এটা উপর থেকে বেশ দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরের খবর এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার জানবার কথা নয়। বিদ্যুতের ঘাটতি কোথায়, এত লোডশেডিং কেন, বিদ্যুৎ বন্টনে অসমতা আছে কিনা, ভোট টানার রাজনীতির ব্যাপার কোথাও কাজ করে কিনা, আমার জানা হয়নি। তবে শোনা গেল, রাস্তা-ঘাটের এত উন্নতি ভাতাড় থানাতে যেমন হয়েছে, এমন আর কোথাও হয়নি। আউশগ্রামে আমার এক নেতৃস্থানীয় আত্মীয় বললেন, একটু ইয়ে ছিল বলে ভাতাড়ে পয়সা গেছে, অন্য জায়গায় অত পয়সা যায়নি।

বাসে করে দশ মিনিটের মধ্যে মুরাতিপুর গ্রামে চলে আসি। এই রাস্তাটি অতি পুরনো। খন্যান থেকে অজয় নদের ধারের মঙ্গলকোট, নতুনহাট আর ওদিকে গুসকরা। মুরাতিপুর গাঁয়ে বাগদিপাড়ার ঢালে গিয়ে নামি। ঢালটাল আর নেই, দুই মানুষ সমান উঁচু মাটি দিয়ে ঢাল ভরাট করে উঁচু রাস্তা গেছে গাঁয়ের ভিতর

দিয়ে। সেই রাস্তায় ঢুকে মামাবাড়ির দিকে এগোতে একটা জায়গায় এসে একেবারে হঠাৎ দশ বছরের বালক হয়ে গেলাম। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে হবে, কোনো এক শিশু বসন্তের সকালের উজ্জ্বল রোদে আড়াল থেকে আম-আঁটির ভেঁপু বাজিয়েছিল মাত্র একবার, জায়গাটিতে এসে সেই শব্দ যেন অপার্থিব লোক থেকে আমার কানে এসে বাজল।

মামাবাড়িতে ঢুকে একটু পরেই যে কথাটা মনে হলো বা হচ্ছে তা এই : যারা বেঁচে ছিল তাদের অনেকেই মারা গেছে। এটা স্বাভাবিক, কিন্তু যারা বেঁচে রয়েছে তারা সত্যিই বেঁচে আছে? এ যে দেখি ঘন মাথার তেলেনাপোতা। তেলেনাপোতার সঙ্গে তফাত শুধু এক জায়গাতেই– এই গাঁয়ে জনারণ্য।

রুখু ধূলোমাখা মানুষ। শীতকালে রাঢ়ে ভারি শুকনো একটা হাওয়া ওঠে। মানুষের চামড়ায় টান পড়ে, বয়েস বেড়ে যায় যেন আচমকা। রাঢ় এলাকায় সেই জন্যেই জাড়কাল পার হওয়া বলে একটা কথা আছে। লোকজন সেই জাড়কাল পেরোচ্ছে বলেই হোক, আর যে-কোনও কারণেই হোক, মুরাতিপুর গাঁয়ে গিয়ে আমাকে খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়তে হলো। জেগে-ওঠার চিহ্নমাত্র তো নেই কোথাও। মানুষের চোখে আলো কই, বেঁচে থেকে বিন্দুমাত্র মজা পাওয়ার ঝিলিক কই! ঘানিটানা বলদের মতো জীবনের দুর্বহ ভার বয়ে বেড়াচ্ছে যেন সবাই। অঞ্চলটা মুসলিম প্রধান– তিরিশ বছর আগে গাঁয়ের সবচেয়ে শিক্ষিত ছেলেটি ছিল ম্যাট্রিকফেল। এতদিন পরে এসে জনে জনে জিজ্ঞেস করে খবর নিলাম, লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটা সামান্যই এগিয়েছে। শুনলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়াটা অবৈতনিক করে দিয়েছেন, স্কুলে স্কুলে টিফিন পর্যন্ত দেওয়া হয়। অতি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ– কিন্তু আমার মুরাতিপুর গ্রামে সেইসব সুবিধে নেবার লোক নেই। ছেলেমেয়েদের যে লোকে স্কুলে পাঠায় না সেটা পুরোপুরি দারিদ্র্যের ব্যাপার না-ও হতে পারে। ছিঁড়েখুড়ে, চেয়েচিন্তে কিছু না কিছু বাড়িতে নিয়ে আসুক ছেলে-মেয়ে, স্কুলে আটকে রেখে লাভ কী– এই বাস্তব হিশেবের বাইরেও আরো অনেক পিছুটান আছে। এইসব পিছুটানের খবর নেওয়া দরকার মনে করি। পিছুটানগুলি ডুবে আছে বিশ্বাস, অভ্যাস, সংস্কারের অন্ধকারের মধ্যে। সেখান থেকে এইসব পিছুটান উপড়ে তুলে ফেলা প্রয়োজন। তা ছাড়া আরো একটা কথা। লেখাপড়া যে পর্যায়েরই হোক না– প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক– এসব পর্যায়ের সঙ্গে জীবিকার যোগটা আদৌ ঘটানো যায়নি তো! অন্য একটি গাঁয়ে ৪০ জন গ্রাজুয়েট– মাত্র ৫/৬ জন চাকরি পেয়েছে, বাকির বেশির ভাগ বেকার, না হয়

নানা ধান্দায় আয়ের পথ খুঁজছে। সে সব ধান্দার আর গোনাগুনতি নেই। নগদ মূল্যটা চোখে দেখতে না পেলে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক লেখাপড়াটাই বা লোকে করতে যাবে কেন? যাই হোক, মুরাতিপুর গাঁয়ে গিয়ে দুপুরবেলার ঝকঝকে রোদের মধ্যে হঠাৎ তেলেনাপোতার ছাই রঙের ম্লান ছায়া নেমে এল। সে ছায়ার মধ্যে মানুষজন মাথা ঝুঁকিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, হাঁক দিলে চোখ তুলে তাকায়, হতাশায় আর কষ্টে যেন বারকতক পিটপিট করে তাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসতে চায়, আর সেই ধূলোওড়া দেহ, অতি ময়লা কিটকিটে একখণ্ড কাপড় জড়ানো কোমরে। মুখে কথা নেই, আসছে, বসছে, চলে যাচ্ছে, কাজ থামিয়ে কোনোরকমে একবার কুশল-বিনিময় করে আবার ধান পেটানোয় মন দিচ্ছে বা গোয়াল থেকে গোবরটা তুলে নিয়ে সারগাদায় ফেলতে যাচ্ছে।

হয়তো বিভ্রম হয়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে। হয়তো কিশোর বয়সের মুরাতিপুর হারিয়ে গিয়েছিল বলেই আমার চোখে ধরা পড়ল এক বিষাদলিপ্ত গাঁ– ময়লা-শাড়ি-পরা বিধবা আর ন্যাংটো শীর্ণ শিশুরা যে গাঁ-টিকে কানায় কানায় ভরে ফেলেছে।

একটু পরেই গাঁয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমি মুরাতিপুরের চটিতে দাঁড়িয়ে রাঢ়ের রোদ আর হাওয়া-ভরা মাঠ দেখছি। দূরে দূরে গাঁ, আবছা, গাঁয়ের ছায়া উঁচুনীচু রেখায় দিগন্তের গায়ে লেগে রয়েছে। খোলা মাঠ আর গাঁয়ের ছায়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোথা থেকে প্রসন্নতা জমা হয় মনের মধ্যে। আমি চৌমাথাটার উপর দাঁড়িয়ে থাকি। বাঁদিকে কলগনা, ডাইনে গুসকরা, পিছনে মঙ্গলকোট নতুনহাট। এসব রাস্তাই পুরনো, শুধু সামনের রাস্তাটি নতুন হয়েছে। আগে ছিল ধুলোয় ভরা, গরুর গাড়ির চাকার দাগে দু-দিকে খাদ। বর্ষাকালে ওই রাস্তার দিকে চাইলে ভয় করত– মনে হত দুর্গম অদ্ভুত সব জনপদের ভিতর দিয়ে গেছে। সেই রাস্তাটি এখন পিচঢালা, পরিষ্কার তক্‌তক্ করছে। দুপুরের রোদে এই চারটি রাস্তা শান দেওয়া কিরিচের মতো ঝকঝকে, রাঢ়ের সমতল শাদা মাঠের বুক চিরে চলে গেছে, সামনে গাঁ পড়লে দুই ফালি করে দিয়ে। এইরকম মাঠে ছেলেবেলায় দুপুরের রোদে একা দাঁড়িয়ে থাকতে খুব ভালোবাসতাম। শীতকালের শেষের দিকের দুপুর হলে দেখতাম, মাঠে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, ফসল তুলে নিয়ে যাবার পর, গরিব দুঃখী যে মেয়েরা মাঠে মাঠে ঘুরে শস্যকণা সংগ্রহ করে বেড়ায়, তারাও আর নেই কোথাও। মাঠ একদম ফাঁকা। দেখতাম ঘূর্ণি হাওয়া উঠত হঠাৎ, ধুলোর স্তম্ভ তৈরি হত। ঘুরতে ঘুরতে তীব্রবেগে ছুটে চলত সেই ধুলোর থাম। আজও অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলাম

amarboi.com

মাঠের দিকে। নাঃ, ঘূর্ণি হাওয়া উঠল না। বোঝা গেল, কিছুতেই কোথাও ফিরে আসা যায় না। সবই অতিবাহিত হয়ে যায়। সবই বয়ে যায়। তা না হলে এখান থেকে কখনো রিকশা পাওয়া যায়? অদ্ভুত ব্যাপার নয়? ধুলোর মধ্যে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া পা ডুবিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রমে এক জোড়া মোষ বোঝাই-গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে, মুখের দুই কষের কাছে জমেছে পেঁজা বরফের মতো ধপধপে শাদা ফেনা। সে সব কোথায়? তার জায়গায় রিকশা। ছই দেওয়া আছে। চৌকো তক্তার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে হয়। মাথা সোজা করার উপায় নেই। ছই-এ লাগছে। খুব বে-আরামের জিনিশ। রিকশ চলতে থাকলে কাছিমের মতো গলা বাড়িয়ে মাঠ-প্রান্তর দেখতে থাকি। সামনের গাঁ-টির নাম কালুকতাক, মুসলমান-প্রধান গ্রাম। ছোটোবেলা থেকে এই গাঁয়ের নাম জানি। জানি, তার একটি মজার কারণ আছে। এই গাঁয়ে একঘর ফকির ছিলেন। বেশ অবস্থাপন্ন গেরস্থ এঁরা, কিন্তু জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। তাতে তাঁদের সম্মানের বিন্দুমাত্র হানি হত না। এঁদের কাজ ছিল শীতের শুরুতে রাঢ়ের মুসলিম-প্রধান গাঁ-গুলিতে গিয়ে শেষরাতে বাড়ি বাড়ি একটা অদ্ভুত একঘেয়ে সুরে গান করা। এক একটি গাঁয়ে সপ্তাহখানেক থাকতেন এঁরা। চার-পাঁচজন একই পরিবারের। সারা মুখে বসন্তের দাগে ভরা কুচকুচে কালো এক বুড়ো, সত্তরের উপর বয়েস, শক্ত মজবুত গড়ন, বাবর শাহের মতো পাকা দাড়ি— ইনিই হচ্ছেন দলনেতা, সঙ্গে তাঁর ৩/৪টি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বছর পঞ্চাশেক বয়েস, অবিকল বাপের মতো চেহারা, বাঁ-হাতটা চামড়া-মোড়া, তার উপর বসে আছে একটি শিকড়ে পাখি। এঁকে দেখলেও বাবর শাহের বংশধর বলেই মনে হত। শীতের শেষরাতে আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মতো চার-পাঁচজন মানুষ সদর দোরগোড়ায় এসে বসেছেন, মাটির দোতলায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, আবছা শুনতে পাচ্ছি ফকিরদের একঘেয়ে গান, 'পয়গম্বরকো ইয়াদ করো— এ আল্লা।' দিনের বেলায় তাঁদের দেখা যেত না। ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে একেবারে মাঘের শেষে একদিন দিনের বেলায় এঁরা আর একবার বাড়ি বাড়ি আসতেন, একই গান এবার চিৎকার করে গাইতেন, তারপর বরাদ্দ চাল ডাল পয়সা ইত্যাদির ছাঁদা বাঁধতেন। এটা যে ওঁদের জীবিকা তাই নয়, এই করেই ওঁরা রীতিমতো অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন। সামনে সেই গাঁ— কালুকতাক। জানি না, ফকির বংশটির খবর কী? জীবিকাটি কি আগের মতোই আছে?

গাঁ-টিকে বাঁ-হাতে পেছনে রেখে এগোলেই পরের গ্রাম বামশোর। আর একটি মুসলমান-প্রধান পল্লি। এককালে যে গ্রামটিকে দূর থেকে ধোঁয়ার মতো

দেখেছি তেতে-ওঠা ধুলোর মেঘের ভিতর দিয়ে— সেই গাঁ-টি যেন লাফিয়ে সামনে এসে হাজির হলো। অবিকল আর পাঁচটা মুসলমান গাঁয়ের মতো। একেবারে আদিম চেহারা। ছোটো ছোটো কালো নোংরা জলের বিষণ্ণ ডোবা, খেজুর, বাবলা বা জিওল গাছে ভরা তাদের পাড়গুলো মনুষ্যবিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। রাস্তার উপর ময়লা আবর্জনা ঢালা, তার উপর মুরগি চড়ে বেড়াচ্ছে, বাইরের সদর দরজার মুখে বা দেউড়ির ফাঁকা জায়গায় ধানের কুড়, খড়ের গাদা এই সব জবর জং করে রাখা। এইরকম একটা উঠোনে ঘর্ঘর শব্দে চেয়ে দেখি দুটি সাঁওতাল মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার ভঙ্গিতে ধানঝাড়াই-এর যন্ত্র চালাচ্ছে। বলতে কী এই প্রথম আমি থ্রেসারের ব্যবহার দেখলাম। সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি ঝাড়াই-যন্ত্রের ব্যবহারে চাষিরা এখন বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। হাই-ইল্ডিং ভ্যারাইটির ধান ঝাড়াইয়ের কাজেই যন্ত্রটার ব্যবহার সম্ভব। থ্রেসারের সুবিধেটা হলো ঝাড়াইয়ের কাজটি চমৎকার করে, 'চিটা'— রাঢ়ের ভাষায় যাকে 'আগরা' বলে— সেগুলো যন্ত্রের ঝাড়াইয়ে ঝরে পড়ে, হাতে পেটানো হলে ঝরে না। ফলে ফসলের ওজন একটু বাড়ে, হাতে পেটানো ধানের তুলনায়। তবে সাবেকি জাতের ধানের বেলায় থ্রেসার ব্যবহার সম্ভব নয়— এসব ধানের খড় অতিরিক্ত লম্বা, থ্রেসারে ঝাড়া সুবিধে হয় না। হাই-ইল্ডিং ভ্যারাইটির চাষ সব সময়ে সব অঞ্চলের চাষিদের ইচ্ছাধীন নয়। জলের সমস্যা আছে। বর্ধমান জেলার এই এলাকায় জল আছে মাটির অনেক নীচের স্তরে, 'স্যালো' এখানে কোনো কাজ করে না। চাষিদের আকাশের আর ক্যানালের জলের উপর নির্ভর করতে হয়! যাই হোক, থ্রেসার বেশ চালু হয়ে গেছে দেখা গেল, যাদের সামর্থ্য আছে তারা থ্রেসারের সঙ্গে একটা মোটর লাগিয়ে ডিজেলে চালাচ্ছে, মজুর-খরচের চেয়ে তাতে ব্যয় কম। তেমন মোটর-চালিত থ্রেসারও দু-চারটি দেখলাম বড়ো চাষিদের খামারে। পা দিয়েই চালানো হোক আর মোটরেই হোক, এর ফলে ভূমি-মজুরের কর্মপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন হচ্ছে কিনা তা আমার সঙ্গী জানাতে পারলেন না। সেখানে উৎকট অসংগতি থাকলে হয় থ্রেসার উঠে যাবে, না হয় ভূমি-মজুরের বেকারত্ব বাড়বে। থ্রেসার উঠে যাবার সম্ভাবনা কম, ভূমি-মজুরের কাজ না পাওয়ার সমস্যাটাই বাড়বে বলে আমার ধারণা।

বামশোর পেরিয়ে খোলা মাঠ, আবার রাঢ়ের নীল আকাশ, আবার সেই মাইল মাইল জোড়া মাঠের আশ্চর্য জনহীনতা। দূরে দেখা যাচ্ছে আলীনগর— আকর্ষিত ধনুকের মতো প্রায় বৃত্তাকার একটি মোরাম-ঢালা লাল রাস্তা গিয়ে

ঢুকেছে আধমাইল দূরের কাফশোর গ্রামে। ওই গাঁ-টিতে ঘণ্টাদুয়েক কাটাব আমি।

পিচ-ঢালা রাস্তাটি ছেড়ে দিলাম। গাঁয়ে আত্মীয়টির বাড়ি গিয়ে শুনি, তাদের জন্যে সুসংবাদ এসেছে। না, আমি এসেছি বলে নয়, আত্মীয়টির স্বামী আজ কয়েক বছর ধরে 'স্যালো' মেশিন চালান, তাঁর চাকরি 'পার্মেন্ট' হবার খবর এসেছে। পরিবারের লোকজনের মুখে খুশি উপচে পড়ছে। অতি ছোটো ভিটেয় একটি খুদে মাটির ঘর, একটি তার চেয়ে ছোটো রান্নাঘর। ওই ছোট্ট ঘরে সুখ আরামের ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ি আমি। সুখের কথাটা একটু ধাঁধার ব্যাপারই বটে।

বিকেলের আগেই আবার আমি প্রায়বৃত্ত রাস্তাটি ঘুরে আলী-নগরের প্রান্তে পিচের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। এখান থেকে মাইল দেড়েক গিয়ে এই রাস্তা সরলরেখায় ভাতাড় থেকে আসা আর একটি পাকা রাস্তা ছেদ করেছে। তারপর সোজা চলে গেছে আরো মাইলখানেক, রাজীপুর গাঁয়ের কাছে। রাস্তা মোটামুটি ওখানেই শেষ।

নিগন স্টেশন থেকে দু-মাইল পুবে আমার নিজের গ্রাম যবগ্রামের দিকে আজ দুপুরে হাঁটতে শুরু করা থেকে এই লেখা! ভেবেছিলাম, গত পরশু কয়েকটি গাঁ ঘুরতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার একটা বিবরণ দাখিল করি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যে মাকড়শার জালের মতো এক সূক্ষ্ম তন্তুতে ভরা, আমার তা ধারণা ছিল না। এখন দেখছি, দু-মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি, পিছনে ফাঁকা মাঠ পড়ে রয়েছে, দু-একটি অশ্বত্থ আর বটগাছ দেখা যাচ্ছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একেবারে সামনেই য-গাঁ। বাঁধা সড়কটা ছেড়ে দিয়েছি মনের ভুলে, কারণ তিরিশ বছর আগে কখনওই সড়ক ধরে গাঁয়ে ঢুকিনি। ঢুকতাম একটা মোটা আলপথ ধরে। এখন দেখছি, সেই আলপথটা হঠাৎ হারিয়ে গেল, ঢুকল গিয়ে একটা বনকুলের জঙ্গলে! সামনে অপরিচিত দৃশ্য— কালো দেয়ালের মতো ঘন এক সারি তালগাছ— হাওয়ায় তাদের বড়ো বড়ো হাতির কানের মতো পাতা অল্প অল্প দুলছে। চেনা জিনিশ পুরোপুরি অচেনা না হয়ে বারো আনা অচেনা আর চার আনা চেনা থেকে গেলে যে অদ্ভুত অপরিচিত অনুভূতির ধাক্কা লাগে, তাতেই আমি খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে থাকি। যবগ্রাম পথ রোধ করে দাঁড়ায়। চেনা চার আনা অংশের জমিও গলতে গলতে মুছতে মুছতে উপে যেতে থাকে।

নিজের দিকে ফিরে

আমি যে কেন লিখি এ-প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই করা হয়। ন্যায়সংগত প্রশ্ন। আমি নানান রকম কাজ করি, তার ওপর আবার লিখতে যাই কেন সে একটা প্রশ্ন বটে। যে ক্ষেত্রটি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র বলে পরিচিত সেখানে যাতায়াত থাকলেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। আপনি লেখেন কেন, আপনি নাচেন কেন, আপনি আঁকেন কেন? কিন্তু এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করে না, আপনি কেরানিগিরি বা আমলাগিরি করেন কেন, কামারের কুমোরের বা জেলের কাজ করেন কেন? বোঝা যায় কাজের রকমফের আছে, কিছু কাজ করলে সে কাজ কেন করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দেবার দরকার পড়ে না, যে কাজের উপযোগিতা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সে কাজ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন নেই। দুঃখের কথা, মোটা দাগে দেগে দেওয়ার মতো তেমন কোনও উপযোগিতা লেখার কাজ, আঁকার কাজ বা বাজানোর কাজের মধ্যে নেই। যদি থাকত তা হলে প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচা যেত। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই লেখা, বিশেষ করে নিজের লেখার কোনও একরকম উপযোগিতা বা যাকে অন্য কথায় জবাবদিহি বলতে পারি তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করি আমি। উপযোগিতা শব্দটা খুব দাগ-লাগা। দাগ-লাগা বলতে খারাপ কিছু বলছি না। খোলা আকাশের নীচে থাকার চেয়ে ঘরের মধ্যে ছাদের তলায় থাকা ভালো। গৃহ মানুষের জন্যে উপযোগী। মানুষের একেবারে স্থূল অস্তিত্বের জন্য। হ্যাঁ, এই হলো উপযোগিতা শব্দের অর্থ। এইরকম উপযোগিতা আমি সাহিত্যের জন্যে কখনওই খুঁজে পাবার আশা করি না। কিংবা বলতে পারি সাহস করি না। কিন্তু সাহিত্যের কাজটা দেখিয়ে দেবার জন্যে আমি উপযোগিতা শব্দটা একটু একরোখাভাবে ব্যবহারও করতে চাই।

একশো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রও কিন্তু এর থেকে তেমন ভিন্ন চোখে সাহিত্যকে দেখেননি। দেশের কল্যাণ আর সৌন্দর্যসৃষ্টি এই দুটি কষ্টিপাথরের কথা বলেছিলেন তিনি। তা হলে আর বাদ থাকল কী? বাদ থাকল শুধু কল্যাণ আর সৌন্দর্য এই কথা দুটিকে ব্যাখ্যা করা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে, তাঁর

amarboi.com

প্রবন্ধ ও নানা রচনায় মানব সমাজের এই দু'রকম ব্যাপারের ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় আমার সায় থাকুক আর না থাকুক, আমাকে আমার লেখায় এই একই ব্যাখ্যা চিরকাল করে যেতে হবে। অর্থাৎ মানুষের সমাজের ব্যাখ্যা। এ থেকে আমার মুক্তি নেই। মানুষকে সামনে রেখেই আমাকে আমার চারপাশের জীবনের, আমার কালের, আমার পৃথিবীর বাস্তবকে ব্যাখ্যা করে যেতে হবে তবে যদি আমার লেখায় বিন্দুমাত্র উপযোগিতা আমি খুঁজে পাই। যে বাস্তবের মধ্যে আমি বেঁচে আছি তার ব্যাখ্যাই আমার লেখার শেষ লক্ষ্য। আমি যে কেন লিখি এই তার কৈফিয়ত।

কী সহজ এই 'বাস্তবতা' শব্দটির ব্যবহার অথচ কী বিশাল এর বিস্তৃতি! দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কালো মানুষদের রক্ত ঝরছে, জেলখানার ভিতরে প্রায় তিন দশকের বন্দি নেলসন ম্যান্দেলার জীর্ণ ফুসফুসে যে ঘুণ পোকারা অনবরত গর্ত খুঁড়ে চলেছে, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের যে দাঁতালো দানব শহর নগর মাঠ প্রান্তর ফুটিফাটা করে চলেছে, যে বহুজাতিক পুঁজি বিশ্বের এক একটা দেশকে ধরে দলামোচড়া করে ছেড়ে দিচ্ছে এই সবই কি আমার আজকের বাস্তবের অংশ নয় যেমন আমার নিজের দেশের দশকোটি মানুষের যুগপৎ আঁকুপাঁকু তলিয়ে যাওয়া আর বেঁচে থাকার সংগ্রামের সাগরগর্জন আমার কালের বাস্তবের অংশ, আমারই অভিজ্ঞতার অংশ। সেই বাস্তবের দিকে আমি যেভাবে সাড়া দিতে চাই একমাত্র তাই হতে পারে আমার লেখার বিষয়বস্তু।

বাইরের বাস্তবতা আমার লেখার বিষয়ে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমার অভিজ্ঞতার অংশ হতে গিয়ে কি বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে? আমি কি আমার লেখার ভিতর দিয়ে সংগোপনে টুকরো টুকরো বাস্তব গড়ে তুলছি যাকে লোকে শিল্পের বাস্তব বলে, যা প্রকারান্তরে বাস্তব থেকে পালাবার এবং লুকোবার একটা উপায়মাত্র। অনেকটা সিনেমায় যুদ্ধ দেখার মতো, যা চমৎকার নিরাপত্তার মধ্যে মানুষের জন্যে করুণা বা সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে, একরকম নিষ্ক্রিয় ভালোবাসার জন্ম দেয়? না, বাস্তবকে অবলম্বন করে এরকম কোনো মোহ আমি তৈরি করতে চাই না। সাহিত্য হাজার রকমের মোহ সৃষ্টি করে। নন্দনতত্ত্বের নানারকমের মার্কা দেওয়া আলোচনার বারো আনা অংশ জুড়েই এই মোহের আলোচনা। কখনও সৌন্দর্যের নামে, কখনও শিল্পের নামে, কখনও প্রচারের দায়ে।

মানুষের বেঁচে থাকার সবটাই বাস্তব, তা থেকে যেটুকুই আলাদা করে

নিয়ে আদিখ্যেতা করা হবে সেটুকুর উপরেই পড়বে মিথ্যার ছায়া, মোহের আড়াল। এটা যেন কিছুতেই না ঘটতে পারে, বাস্তবের আটপৌরে, বাস্তবের দৈনন্দিন সাহিত্যের মধ্যে এসে যাতে একটা আবছা দেয়ালের আড়ালে যেতে না পারে সেটা দেখাই হচ্ছে শিল্পের কাজ। শিল্পের কাজ আমার কাছে তাই মোহসৃষ্টি নয়, মোহমুক্তি ঘটানো। আমার এই কথা থেকে কেউ যেন চট করে না ধরে নেন যে শিল্পের একমাত্র কাজ হচ্ছে প্রতিরূপ তৈরি করা, অবিকলের দাসত্ব মেনে নেওয়া। বাংলা কথাসাহিত্যের নব্বুই ভাগই চেনা জীবনযাত্রার অবিকল বিবরণে ভরা এবং সেটা বেশ সন্তোষজনকও বটে, ব্যাবসা সাফল্যেও কম যায় না, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক কী? কথাটাকে এখন এইভাবে ঘুরিয়ে বলা যায় যে সাহিত্যের উপর থেকে যখন সমস্ত আস্থা চলে গেছে, সাহিত্যের কিছুমাত্র কাজ আছে এই বিশ্বাস যখন উধাও একমাত্র তখুনি সাহিত্যকে গাধা বানিয়ে তাকে দিয়ে বাস্তবের অছিলায় ভাড়া খাটিয়ে নেওয়া যায়।

আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি আমার ক্ষমতা শোচনীয়ভাবে সীমিত, যৎকিঞ্চিৎ। বাস্তবকে নিয়ে আমি যা করতে চাই না, যখন ঠিক তাই করে ফেলি, সোজা রাস্তা ছেড়ে আমার কলম বাঁকা রাস্তা ধরে, দিনের আলোর সঙ্গে বসন্ত-জ্যোৎস্নার মেদুরতা মিশে যায়, তখন বাস্তবের সীমা নিয়ে আমাকে মহা ফেরে পড়ে যেতে হয়। বাস্তবের যথাযথ ছাপ পড়েছে যে মনোভূমিতে, যেখান থেকে লেখার শুরু সেখানে চেয়ে যখন দেখতে পাই জায়গায় জায়গায় আবছা, শুকনো ডাঙার কোথাও কোথাও ভাঙা বা টলটলে জলে ভরা, আলো-ছায়ার এক ধরনের মায়া তখন কি ধরে নেব অভিজ্ঞতাকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে পারছি না, বুদ্ধির জাঁতায় কবজা হচ্ছে অংশমাত্র, বাকিটা পড়ে আছে বোধের বাইরে? ধরে কি নেব যে বাস্তবের বোধ পুরো হয়নি বলেই জল-মেশানো দুধের মতো জলো কল্পনা আর কাঁচা আবেগ মিশিয়ে সাহিত্যের নামে একটা ভেজাল জিনিশ তৈরি করছি? কখনও কখনও হয়তো তাই। কিন্তু সব সময়ই কি তাই?

ছেলেবেলায় রাঢ়ে থাকতে সর্ব প্রাণীর শেষ আশ্রয়গুলি আমাকে ভীষণ কুহকে টানত। আমি একা একা শ্মশানে বা গোরস্থানে ঘুরে বেড়াতাম। রাঢ়ে গাছপালা কম। মনে পড়ছে এক নির্জন দুপুরবেলায় জষ্টি মাসের প্রচণ্ড হাড়-ফাটানো রোদে হলুদ রঙের বড়ো বড়ো ঘাসের মধ্যে বসে আমি ধসে-পড়া কবরের মধ্যে আধো-অন্ধকারে শুয়ে থাকা একটা কঙ্কালের দিকে

চেয়ে আছি। যেন শাদা কাগজ কেটে তৈরি একটা মানুষ শুয়ে আছে, কিছুমাত্র ওজন নেই। কাগজ-কাটা মানুষটাকে যেন হাতের তেলোয় গুটিয়ে মুটিয়ে রাখা যাবে। ওর নিজের যেমন ভয় ব্যথা বেদনা কিছু নেই, আমার মধ্যেও ও তেমনি এতটুকু ভয় ব্যথা বেদনা জাগাতে পারছে না। কী ভয়ানক নির্বিকারত্ব, কী অকল্পনীয় ঔদাসীন্য। আমার সামনে বৃক্ষহীন শাদা সমতল মাঠে জষ্টির রোদ কটকট করছে। প্রায় শাদা আকাশ আর তার নীচের পৃথিবীর মাঝখানে বাতাসে মেশা ধুলো অতি ধীর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি কপালের ওপর হাত রেখে একবার সেদিকে তাকাচ্ছি, আবার চোখ ফিরিয়ে কবরের কালো গর্তের ভিতর শুয়ে থাকা শাদা কাগজের মানুষটির দিকে চেয়ে দেখছি।

বহুকাল পর্যন্ত বাস্তব শব্দটা শুনলেই আমার চোখে এই দৃশ্যটা ফুটে উঠত। যখন জলভরা ভিজে শ্যামল জায়গায় এলাম তখনও তাই– ভাগাড়ে একটি মোষের নীচের চোয়াল আর পাঁজরের ধপধপে শাদা হাড়গুলো অনন্তকাল ধরে রোদে শুকোচ্ছে। বাস্তব কি এইরকম? অসংখ্য মানুষ চোখে পিঁচুটি নিয়ে গালে হাত দিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে আছে। হাজার হাজার একর জমির ফসল জলের নীচে তলিয়ে গেছে, তাদের সামনেই আছে সেই দৃশ্য, তারা চেয়েও দেখছে না। তাদের কুঁড়েগুলো বেঁকেচুরে মুখ থুবড়ে পচা স্থির জলের মধ্যে পড়ে আছে। ভাদ্রের শেষ বিকেলের গুমোট গরমে সব কিছু জ্যান্ত অবস্থায় পচে যাচ্ছে। মানুষ গরু ভেড়া ছাগল কুকুর বেড়ালের সেই সম্মিলিত পচে যাওয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কী নির্বিকার সেইসব আধন্যাংটো কালো কালো গালে হাত দেওয়া মানুষ। ঠিক যেন চক্ষুহীন দৃষ্টিপাতে অন্ধ শুয়ে-থাকা ওজনহীন, ব্যথা বেদনাহীন শাদা মানুষ।

এইরকম বাস্তব চারদিকে। সামান্য রদবদল মাত্র। কোথাও চিৎকার হল্লা, শিরাফোলানো আক্রোশ, কোথাও উদ্যত গাঁইতি শাবল। কিন্তু বাস্তব যত বিচিত্র চেহারা নিয়েই আমার সামনে উপস্থিত হোক না কেন– আমার সামনে, মানে লেখক আমার সামনে– তার মূল চেহারা যেন একটাই : রাঢ়ের রোদ পোড়া খোলা মাঠের মধ্যে কটকটে শাদা এক করোটি চক্ষুহীন দৃষ্টিপাতে সীমাহীন শূন্যে চেয়ে আছে। মহাজন কড়ি গুনছে, কারখানার মালিক মজুরকে কলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, জোতদারের গোলায় সারা বছরের খোরাকি তুলে দিয়ে আসছে ভাগচাষি, বেশ্যার দেওয়া টাকা গুনছে মন্ত্রী– এইসব, এইসব। এইরকম অন্তহীন ফিরিস্তি হাজির করতে পারা যায়। জানি বাড়বাগ্নির মতোই

amarboi.com

গনগনে আগুন আছে মানুষের পাঁজরের তলায়, তা কখনো জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। যেমন ভীষণ নৈঃশব্দের মধ্যে পেষণের ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা যায়, তেমনিই শোনা যায় বাতাসের মধ্যে আগুনের ভেসে চলার হিস হিস।

বাস্তব ডাইনে বাঁয়ে হেলে না। সে সিধে খাড়া থাকে। মন্ত্র পড়ে তার কিছু করা যায় না। গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাকে বিশুদ্ধ করা চলে না। তাকে কোনওভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেও লাভ নেই। সব দায় পাশ কাটিয়ে চলার জন্যে সাহিত্যিক যখন বলেন তিনি সত্যিকার অর্থে কিছুই জানেন না একমাত্র নিজেকে ছাড়া তখন তিনি সত্যি কথা বলেন না। এই কথা বলে তিনি জানাতে চান বাইরের জীবনের তিনি দর্শক মাত্র। ভিতরে ঢোকার উপায় তাঁর নেই, কাজেই সব দরজায় তালা দিয়ে একমাত্র নিজের কথা বলাই সত্য বলার উপায় তাঁর। কিন্তু তিনি কি জানেন যে বাইরের জীবনের মতোই তিনি নিজেও নিজের জীবনের দর্শক মাত্র। যে বাস্তবের অংশ তিনি, নিজেকে দেখার ভিতর দিয়ে তিনি সেই বাস্তবকেই দেখে থাকেন? বাস্তবকে যেভাবে দেখতে তিনি বাধ্য হন সেইভাবে নিজেকেও দেখেন তিনি। মানবজন্ম পাবার পর মানবজীবনের যেসব শর্ত না মেনে তাঁর উপায় নেই, সেইসব শর্তেই তিনি নিজেকে আর বাইরের জীবনকে দেখতে বাধ্য। খুবই সত্যি কথা যে চেতনায় ঢোকার পথ না পেলে বাস্তব নেই, চেতনায় না আসতে পারলে অহং-ও নেই। কাজেই বিচ্ছেদই বলি, পারক্যের বোধই বলি, সবকিছুর ব্যাখ্যা বাস্তবের মধ্যেই, বাস্তবের অংশ হিশেবে।

লেখক হিশেবে আমি এই বিশ্বাসে এসে পৌঁছেছি যে বাস্তবকে না মানার কোনো স্বাধীনতা না থাকলেও তার রূপান্তর প্রতি মুহূর্তেই মানুষ ঘটিয়ে তুলছে। মানুষ অর্থাৎ মানুষের শ্রম। মানুষের সমাজে মানুষের শ্রম যখন মুক্ত হবে একমাত্র তখুনি মানুষ তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাস্তবকে বদলে দিতে পারবে। যতদিন লেখক থাকব বাস্তবের ভিতরের জল ও আগুনের গল্প লেখার চেষ্টা ছাড়া আর কী করতে পারি আমি? বাস্তবের গায়ে স্তরান্তরিত বাস্তবের প্রতিফলন ফেলার চেষ্টা ছাড়া? বাস্তবকে নিয়ে মোহসৃষ্টি নয়, কিন্তু বাস্তবের কোনো অংশেই কি মোহ নেই? যদি তা নাই-ই থাকে তা হলে বাস্তবের স্তরান্তর ঘটানোর চেষ্টার ব্যাখ্যা কী?

জোড়খোলা সেলাই-রেখায়

সকাল দশটায় বেরিয়েছি। তানোরে একটি সাঁওতাল গ্রামে যাব। দুটি সাঁওতাল ছেলে এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। পথঘাট আজকাল ভালোই। সরু পাকা রাস্তা। গ্রাম এলাকার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। খুব ভেতরে যাওয়া কঠিন নয় তেমন। তানোর ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে বারো-তেরো কিলোমিটার দূরে কমলা ইউনিয়ন। আরো তিন-চার কিলোমিটার গেলে মনে হয় দেশের একেবারে প্রান্তে অমৃতডাঙি সাঁওতাল গ্রাম। দেশের সঙ্গে আলগা সেলাইয়ের জোড়ের মুখ এখানে। একটু অবাকই হই যখন শুনি গ্রামের নাম অমৃতডাঙি। খাঁটি বাংলা নয়, একটু তৎসমও যোগ হয়েছে। সাঁওতালরাই কি এই নাম রেখেছে? এরকম চমৎকার নামে সাঁওতালদের আরো গ্রাম আছে—সুন্দরপুর, বর্ষাপাড়া। একটু পরে আমাকে আরো অবাক হতে হবে যখন সাঁওতাল যুবক-যুবতিদের দু-একজনের নাম শুনব। যে-দু-জন তরুণ আমাদের নিতে এসেছে, তাদের একজনের নাম দূরবীন। ওর নামটা কে রাখল, তা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি।

দূরবীন জানাল গাঁয়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। তিন-চারদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর আমাদের রবাহূত হবারও উপায় নেই। পুরো গাঁয়ের লোক বরযাত্রী— কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না— কাউকে বাদ দিয়ে যদি বিয়ে হয়, তবে সেই বিয়েকে আর সাঁওতালি বিয়ে বলা চলবে না। ওদের গ্রাম-সমাজ পুরোপুরি জমাট, কোথাও ফাটল নেই, উঁচু-নীচু টক্করও নেই। অবশ্য কাল বদলেছে, বড়ো বড়ো সেলাইয়ের জোড়ও দ্রুত খুলে যাচ্ছে— ওরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে প্রতিবেশী বড়ো সমাজ থেকে— আবার প্রতিবেশী সমাজের বেনোজলে ভেসেও যাচ্ছে। এখন এমনকী খোদ সাঁওতালি সমাজেও অসংখ্য ফাটল দেখা দিয়েছে। তবু জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এইসব অপরিহার্য অনুষ্ঠানে গোটা সমাজের অংশ নেওয়া এখনও বজায় আছে। সাঁওতাল শিশুর জন্ম হলে বাড়ির চালে লাঠির বাড়ি মেরে সবাইকে জানান দিতে হয়। তা হলে বিয়ের মতো অনুষ্ঠানে কাউকে কি বাদ দেওয়া যাবে? শোনা গেল

তিন-চারদিন আগে বরযাত্রীরা পাশের গাঁ থেকে বর-কনে নিয়ে এসেছে। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া। কনের সঙ্গে যারা এসেছে শুধু তাদের নয়, তাদের সঙ্গে বরের গাঁয়ের লোকদেরও খাওয়াতে হবে।

প্রথার ব্যত্যয় হওয়া চলবে না। আয়োজন মন্দ নয়। একটি মাঝারি সাইজের সিলভার-কার্প কেনা হয়েছে। দেড় কেজি-দুকেজি হতে পারে। তার সঙ্গে আলু মিশিয়ে একটি ঘাঁটি তৈরি হবে, সঙ্গে ভাত। ব্যস, আর কী চাই। টাটকা মাছের গুঁড়ো মেশানো আলু-ঘাঁটি আর ভাত। রাজকীয় ভোজ। সবাই পেটপুরে পাবে কিনা তার ঠিক নেই। কথা শুনে বুঝতে পারা গেল, এর বেশি কিছু করার সামর্থ্য নেই। একটা শুয়োরের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। শুয়োর পোষা হয় বিক্রির জন্য। তার মাংস খাবার বিলাস কেউ করতে পারে না।

দুপুরের জন্য রান্নাবান্না চলছে একদিকে, অন্যদিকে বাড়ির বাইরে খোলা মাঠের একপ্রান্তে সাঁওতাল যুবক-যুবতিদের মাদলের সঙ্গে নাচ-গানও চলছে একটানা। শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার, আরো দু-একদিন চলবে। মোটকথা একসপ্তাহ আগে অনুষ্ঠান শেষ হবার কোনো কথা নেই। যে বাড়িতে বিয়ে সেই বাড়ির লোক থাকল কি থাকল না, তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের সম্মতির কোনো তোয়াক্কা নেই। সাতদিন অনুষ্ঠান চলবেই। আমরা মহামান্য অতিথি। বাড়ির বাইরের দিকে একটি ভাঙাচোরা দাওয়ায় আমাদের বসানোর ব্যবস্থা হলো। আমরা যে-কজন অতিথি ছিলাম তাদের জন্যে আনা হলো চেয়ার, মোড়া— এইসব। এইসব চেয়ারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। বসার পরে প্রতি মুহূর্তে ভয়, কখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। আমরা বসতেই কয়েকটি যুবতি আর কিশোরী সর্ষের তেল, গামলায় পানি আর হাতে গামছা নিয়ে একেকজন একেকজনের পায়ের কাছে বসল। তারা কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব অস্বস্তিতে পড়লাম। জুতো তো খুলে দেবেই, মোজাও তারাই খুলবে। যখন বুঝলাম কোনও আপত্তিই তারা শুনবে না, বরং এই আনুষ্ঠানিকতাটুকু করতে না দিলে তাদের অপমানই করা হবে, তখন বাধ্য হয়ে নিজেদেরই জুতো-মোজা খুলে ফেলতে হলো। তখন মেয়েরা প্রত্যেকের পায়ে সর্ষের তেল মাখিয়ে গামলার পানির মধ্যে একেকজনের পা ডুবিয়ে আস্তে আস্তে ধুয়ে দিল। তারপর সেটা করা হলে গামছা দিয়ে সকলের পা মুছিয়ে দেওয়া হলো। আমি বুঝতে পারি, এই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে হয়তো পুরো সাঁওতাল সমাজের একটা দাস-অধীনস্থ মনোভাব প্রকাশ

amarboi.com

পায়, যারা এরকম সেবা নিতে পারে তারাও নিশ্চয় নিজেদের প্রভু বা মালিক বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারি না। কোথাও কি এই আনুষ্ঠানিকতার ভিতর দিয়ে গভীর একটা মানবিক আন্তরিকতা প্রকাশ পাচ্ছে না? আমি এখনও খুব নিশ্চিত নই। কিশোরী মেয়েদের পরনে স্কুলের পোশাক ছিল। পা মুছিয়ে দিয়ে তারা আবার প্রণাম করল।

ওদিকে মাঠের ধারে নাচ-গান চলছে। সেই পরস্পরের কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এক পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে ক্ষান্তিবিহীন নাচ আর দ্রিমিদ্রিমি মাদলের বাজনার সঙ্গে একঘেয়ে গান। রোদ চড়ছিল। শুনতে শুনতে মহুয়ার মদের ক্রিয়ার মতোই আস্তে আস্তে নেশা জমে ওঠে, কেমন ঢুলুনি আসে। মগজে সেঁকো বিষ যেন কাজ করছে, ধীরে ধীরে স্নায়ু বিবশ হয়ে আসছে। মনে হলো দেহ-মন বাস্তবতা হারিয়ে ফেলল, কী রকম একটা নির্বেদ অস্তিত্বের গোড়াটা যেন নিস্তেজ করে দিল।

ঘোর কাটানোর জন্যেই জোর করে উঠে আমরা একটা জীর্ণ, যৎকিঞ্চিৎ বাড়ির উঠোনে বর-কনের কাছে গেলাম। দেখি, একেবারে বাল্যবিবাহ। বরের বয়স ষোলো-সতেরো, কনের বয়স বারো-তেরো। শুনতে পেলাম আবার দুটি চমৎকার নাম– বরের নাম অরিন্দম হাঁসদা, কনের নাম শান্তশ্রী সরেন। এরকম আশ্চর্য সুন্দর নাম কে রেখেছে ভেবে পাই না।

এই বয়সে এরা বিয়ে করেছে কেন তার কোনো জবাব নেই। বলতে গেলে এদের নিয়ে কোনও প্রশ্নেরই কোনও পক্ষ থেকে কোনও জবাব নেই। বিয়ে যে করেছে, কোনও ঘর কি আছে তাদের মাথা গোঁজার জন্যে? এদের কি এক ছটাক জমি আছে? দৈনিক মজুরির বদলে দেহদুটিকে ভাড়া দেবার জন্য নিশ্চিত কোনও কাজ কি আছে? এইসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। এই দুটি প্রাণীর জীবন-জীবিকা সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নে সমাজ-রাষ্ট্র-দেশ মুখে তালা দিয়ে থাকবে। তবু এই দুটি বালক-বালিকার বয়স হবে, তাদের রমণ করতে হবে, সন্তান উৎপাদন করতে হবে, সংসার করতে হবে এবং অবশ্যই অকালে অপুষ্টিতে মরতে হবে। তখনও তারা কোথায় থাকবে তার স্থির নেই। পোড়ানোর জায়গা নেই, জ্বালানি নেই। মাটির তলায় শোবার জন্য এতটুকু জমি নেই। সাঁওতালদের দলিলপত্র কোনওদিনও ছিল না, এখনও প্রায় নেই। এই রাষ্ট্রের নিয়মে তারা মাটি-জমি-জল কোনওকিছুই দাবি করতে পারে না। আমরা আমাদের সংবিধানে একটা পঙ্‌ক্তি লিখেও স্বীকার করিনি যে, বাংলাদেশে ছোটো জাতিসত্তাগুলোর কোনও অস্তিত্ব আছে।

অরিন্দম আর শান্তশ্রী কচি মুখ আর কালো ঝকঝকে চোখ তুলে সমাজের দিকে চেয়ে থাকে। বাঁচবার জন্য দু'খানি দেহ ছাড়া আর তাদের কিছুই নেই। এই ছোট্ট বাড়িটি তাদের পিতামহের। কিন্তু তা একটা আলগা সম্পত্তি। যে-কোনও সময় ফসকে কোনও ভূমিগ্রাসীর কবলে পড়ে যেতে পারে। তা হোক, এখন অরিন্দম আর শান্তশ্রী এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক, আনন্দ-ফুর্তি করুক, জীবনের শোক-তাপ-ব্যথা-বেদনা-উপভোগ সব সুদে-আসলে উসুল করে নিক।

আমরা বর-কনেকে বরের পিহামহের এক চিলতে উঁচু-নিচু উঠোনে রেখে চলে এলাম। বাতাসে নিশ্বাস নেওয়া কঠিন। সমস্ত বাড়ি জুড়ে বিচিত্র একটা গন্ধের পর্দা ঝুলে আছে। পচা গন্ধের সঙ্গে গাছের ডালপালা শুকনোর রুখু গন্ধ, মুরগির বিষ্ঠার আঁশটে গন্ধ, একপাশে বাঁধা রুগ্‌ণ একটা শুয়োরের বিষ্ঠা আর পচা কাদার গন্ধ– ঈশ্বরের পৃথিবীতে এরকম জায়গা থাকতে মানুষের শাস্তির জন্য আবার নরকের কী দরকার!

বাইরে বেরিয়ে আসি। গান-বাজনা-নাচ বিরতিহীন চলছেই। কী ওরা গাইছে? একটু বাংলা করে দিতে অনুরোধ করতেই মেয়েগুলো গানটা বাংলাতেই গাইতে শুরু করল :

'দোষ কর‍্যাছি বড়ো ভাই দোষ কর‍্যাছি
অপরাধ কর‍্যাছি বড়ো ভাই অপরাধ কর‍্যাছি'

আরেকটি গান :

'বাবা কিন্যা দিলে হানমোনিয়াম
বাবা বানিয়ে দিলে বাঁশি
আমি সোকালে কাজে যাবো কখন তবে বাজাবো।'

আমরা চলে আসব। এখন একটু আপ্যায়ন না করলে তো চলে না। মিষ্টি-গুড়-কলা-বিস্কুট বা এই জাতীয় কিছু আশা করেছিলাম। গিয়ে দেখা গেল, একটি বড়ো জগভর্তি হালকা সাদা হাঁড়িয়া বা পচানি। সঙ্গে ছোটো-বড়ো কয়েকটি গ্লাস। খুবই সংক্ষিপ্ত আয়োজন!

দূরবীনের নিকট-দূর

আজকাল দেশের ভিতরে ঢুকতে আমার ভয় করে। দেশের ভিতরে, মানে ইংরেজিতে কথাটা কানে এলে বেশ মিষ্টি লাগে 'কান্ট্রি-সাইড', গ্রাম এলাকা, মফস্বল, গ্রামাঞ্চল। ভয় যে লাগে তা কিন্তু রোমাঞ্চকর নয়, উত্তেজনা-আনন্দ-উদ্‌বেগ মেশানো ভয় নয়, গভীর রাতে পলেস্তরা-খসা, লোনা-লাগা, মিহি লাল ধুলোয় ঢাকা বিরাট, পোড়ো বাড়িতে ঢুকে পড়লে যেমন হয়। ভেঙে-পড়া কড়ি-বরগায় বাদুড় চামচিকে ঝুলছে, ভাঙা পাঁচিল, বড়ো বড়ো গাছ—ঠিক যেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'দি ফল অব দি হাউস অব আশার' গল্পের মতো বাড়ি। না, এরকম ভয় নয়, অন্যরকম। শুকনো বরেন্দ্র এলাকার উঁচু-নিচু ঢেউ-তোলা একেবারে ন্যাংটো মাঠে রোদ যেন ককিয়ে কাঁদে, মনে হয় রোদ, আসলে বাতাস। খোলা মাঠে কখনো ধুলোবালির ঘুরন্ত থাম উঠে যায় আকাশে, কখনো তালগাছের দখল হাতির কানের মতো পাতা নেড়ে শব্দ তোলে। গা ছোঁক-ছোঁক করে অদৃশ্য বুনো কুকুররা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তাদের লাল জিভ খোলা ছুরির ফলার মতো। আর চারদিকে রক্তচক্ষু। দেশের ভিতরে ঢুকতে আমার সত্যিই ভয় করে।

যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল তাদের জিজ্ঞেস করলাম। একজনের নাম দূরবীন। সে আবার সাঁওতাল নয়, ওঁরাও। সাঁওতালি সাদরি ভাষায় কথা বলে নিজেদের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে বাংলায়। শাদামাঠা বাংলাই বলে, দু-একটি টান আলাদা আর দু-একটি শব্দের উচ্চারণ। সাঁওতালত্ব তেমন কিছু নেই।

একটো গেরামে লিয়ে যাবো— সে বলল।

দূরবীন, তোমার দূরবীন নাম কে রেখেছে? কতদূর দেখতে পাও? দূরের জিনিশ বড়ো দ্যাখো, না ছোটো দ্যাখো?

কাচের সঙ্গে লাল সুতো বাঁধা চশমার ডাঁটি দুটি যেন নিমের শাদা শুকনো ডাল দিয়ে তৈরি। সেটা চোখ থেকে খুলে দূরবীন বলল, খালি চোখে দেখতে

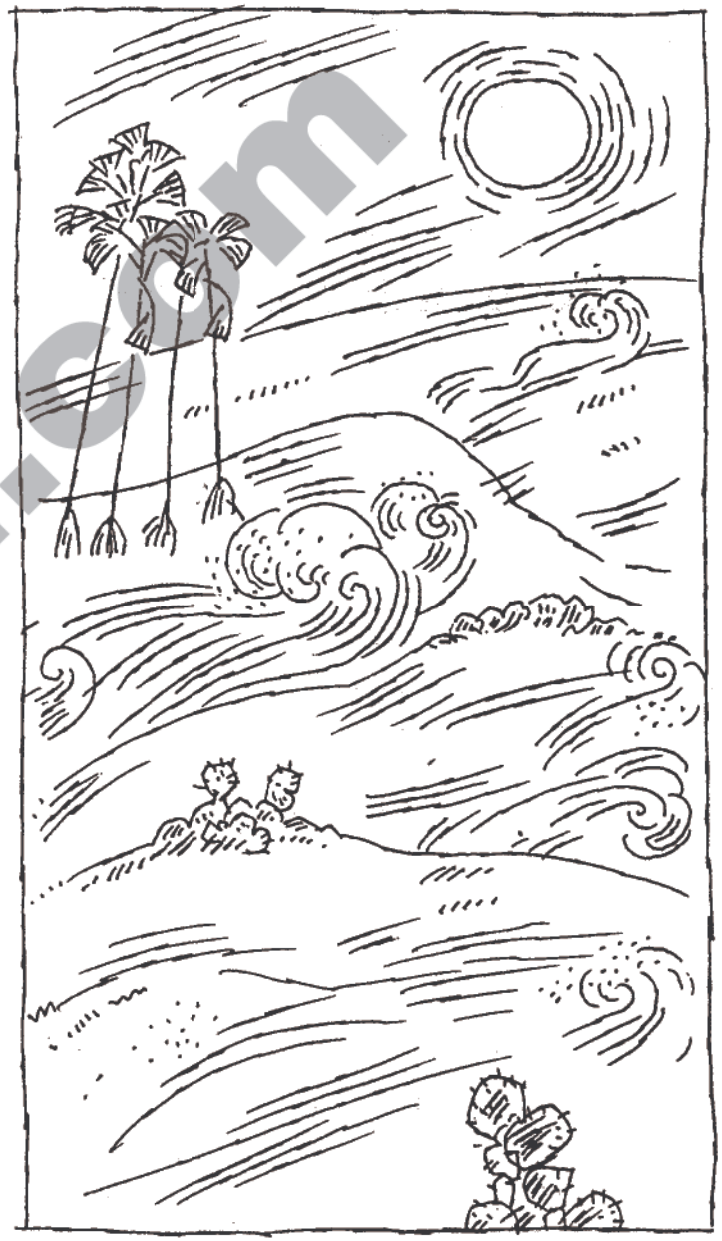

amarboi.com

পাই না ছার, আপনাকেও দেখতে পাছি না। আমাকে চশমা লিতে হইছে ছোটোকালে।

ভালো কথা। আমাদের কোন গ্রামে নিয়ে যাবে? গাড়ি কতদূর যাবে?

গাঁয়ের নাম ছার অম্রিতডাঙা, খালি সাঁওতালদের বাস। এক ঘরও বাঙালি নাই। পাশের গাঁয়ে আমরা আছি, ওঁরাও। রাস্তা পাকা, বড়ো পাকা রাস্তা থেকে মাঝারি পাকা রাস্তা, তার পরে সরু কাঁচা রাস্তা, শেষে বিল, বিল পাড়ের কাঁচা রাস্তা–

খবরদার দূরবীন, গল্প বলবি না, কোনো গল্প নয়।

ঠিক আছে চলেন। গাঁয়ের লোকেরা জানে, আপনারা যেছেন। ভালোই হছে। একটো বিহার লাচ-গান চলছে আজ। দুপুরে গাঁয়ের লোকের ভোজ।

গল্প বলিস না দূরবীন। যদি বলিসই, টানা গল্প নয়, মাঝে মাঝে ঘুলিয়ে দাও। খানিকটা করে 'সত্যি' গল্পের মধ্যে মেশাও, ময়ান দাও।

সঙ্গে যাঁরা যাবেন সেই বন্ধুদের দিকে চেয়ে আমি চোখ টিপি। দূরবীন বিভ্রান্ত, কী কহিছেন ছার?

কিছু না! আজ বিয়ে বলছিলে না?

বিয়ে হঁয়ে গেঁইছে বেস্পতিবার, আজ রবিবার, আজ বরের গাঁয়ের আর কনের গাঁয়ের অতিথিদের খাওয়া হবে।

কত লোক খাবে দূরবীন? আচ্ছা দূরবীন, তোমার সঙ্গের এই ছেলেটির নাম কী?

ওর নাম যোহান ছার। কত লোক খাবে জিগাছেন? সাঁওতাল গাঁয়ের তিরিশ ঘরের সব লোক, ধরে ল্যান দুশো লোক আর কনের গাঁয়ের লোক, ধরে ল্যান একশো। তিনশো– এই তিনশো লোক খাবে ছার।

কী খাওয়ানো হবে জানো?

খিঁচুড়ি ঘাঁটি।

খিঁচুড়ি ঘাঁটি আবার কী?

চাল ডাল আর মাছের ঘাঁটি হবে ছার।

এত চাল ডাল জোগাড় হবে কী করে দূরবীন?

লোকে সব দিবেক। যে যেমন পারে দিবেক। চাল ডাল দিবেক। যা দিবে তাই রান্না হবে। খাতে খাতে শেষ হয়ে গেলে আর নাই।

আর মাছ কে দেবে? রুই মাছ?

না ছার, সিলভার কার্প। এই মাছটো কিনতে হবে ছার। বরের দাদাকে

কিনতে হবে। নিজের পয়সায় কিনতে হবে। একটা দ্যাড় দু-কেজি সিলভার কার্প কেনা হছে দেখে এয়েছি।

অত চাল ডালে দু-কেজি মাছে কী হবে?

আঁশটে হবে ছার– আমিষ খাওয়া হলো তেবে। মাছের একটো কাঁটাও পাবে না কেউ। তেবু আমিষ খাওয়া তো হবেক।

একটা শুয়োর-টুয়োর মারা হবে না দূরবীন?

ওরে বাবা, শুয়র পাবে কুথা? সহজ কথা শুয়র কাটার খ্যামতা কুনো সাঁওতালের নাই সারা গাঁয়ে। শুয়র তো পালতেই পারে না– শুয়ারের খাবার জোটাবে কুথাকে। খাল নাই, মাটি নাই, ফল নাই, মূল নাই, পুখুরের কাদা নাই, গরুর গোবর, মানুষের গু কুছু নাই।

এই দূরবীন, আবার গল্প বলছিস?

গল্প কই ছার?

পচুই তো দেবে খাওয়ার আগে পরে।

পচুই পাবে কুথা?

মলো যা, পচুই-ও নাই সাঁওতালদের?

সাঁওতালদের 'সাঁও' নাই, 'তাল'-ও নাই ছার।

দূরবীন আস্তে আস্তে দূরে যেতে থাকে। দূরবীন দূরে যাচ্ছে আর ছোটো হচ্ছে না, বড়ো হচ্ছে?

আমি একজনকে ইচ্ছে হলে দূরবীন করে দিতে পারি ছার। মাত্তর একজনকে পারি। জনমের পর আমার মা কানে ফুঁ দিয়েছিল, বাপ আমার চোখে আমার ছোট ভাইয়ের নুনু বুলিয়ে দিয়েছিল। আমার মায়ের গভ্ভে ছিলাম আঠারো মাস, আর জরমো যখন হলো, আমার ছিল এক ইঞ্চি পরিমাণ একটু একটা লেঙুর।

দূরবীন, কতবার বলব গল্প বোলো না! আমরা একটু যাব তোমাদের ওদিকে। যাব, আবার ফিরে আসব। উঁকি দিয়ে দেখার মতো। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে, বিরাট গাড়ি, চওড়া চওড়া খাঁজকাটা বড় বড় চাকা, মাটি খামচে ধরবে, পিছলে পড়বে না, উলটে যাবে না। গাড়ির ভিতরে গান আছে, বাস আছে, সুবাস, আর আছে ঠান্ডা–

আমি জানি ছার, গাড়ি আপনাদের এ. ছি.–

ঠিক। ওই গাড়িতে আমরা যাবো, তোমাদের এই রোদ আর ধুলো আর গরম আমাদের কিছু করতে পারবে না। দূরবীন, একটা উঁচু পাড়ওয়ালা দিঘির

পাশ দিয়ে যেয়ো যেখানে পদ্ম আছে। আর আবার বলছি, খবরদার এক ফোঁটা গল্প বলবে না। আমরা দেখতে এসেছি, গল্প শুনতে আসিনি।

আমরা পাজেরোর মধ্যে ঢুকি, যেন রাজপ্রাসাদের একটি ঠান্ডা শীতল কক্ষে বসি। সিগারেট খাওয়া যায় না, কিন্তু বিয়ার চলে। আশির দশকে, দেশের ভিতরে ছোটো বড়ো মাঝারি সাপের দল কুণ্ডলী পাকিয়ে নানা দিকে মুখ বাড়িয়ে থাকলে যা হয় তেমনি পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছিল। সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা তৈরি হলে দেশটাই সুন্দর চকচকে তকতকে হয়ে ওঠে। আর তখন সেই সব জটিল জালের মতো রাস্তায় জাপান ভারতের গাড়িগুলো নামতে শুরু করে। দেশটাকে দেখাতে থাকে বিলেত আমেরিকা। রাস্তায় এক একটা পাজেরো যেন সাইবেরিয়ার রাজহাঁস। যখন গাড়ি ছাড়ছে দূরবীনকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা দু-জন কি আমাদের সঙ্গে যাবে? জায়গা আছে গাড়িতে। তোমরা না গেলে আমরা চিনবই বা কী করে?

হেঁ, আপনাদের সাথ তো যাতে হবেক। তবে আপনাদের গাড়িতে যাবো নাই। আপনাদের সঙ্গে যাবার লেগে পিরিন্সিপ্যাল সাব আমাদের একটা হোন্ডা সাইকেল যোগাড় করে দিছেন।

কড়া রোদে মসৃণ রাস্তা ঝলকাচ্ছে, আয়নায় রোদ পড়লে যেমন হয়, চোখ হঠাৎ হঠাৎ ধেঁধে যায়। দূরের রাস্তায় জলের দাগ, যেন ভেজা, কাছে গেলেই বোঝা যায় মরীচিকা। রাস্তা একটু স্নান করে নিতে চাইছে।

সামনেই থাকো দূরবীন, তোমার হোন্ডার পিছনে আছি আমরা।

পাজেরোর কাচ তোলা, ঠান্ডায় ভরে উঠছে ভিতরটা, রোদের গায়ে নতুন কালো মেঘের রং-ধরানো, গতি নিঃশব্দ, আমরা গাড়ির ভিতরে নিজের নিজের আসনে যেন জগাই মাধাইয়ের গান, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতি নারীর কোল। হ্যাঁ, বেশ আঁটো-সাঁটো শক্ত-নরম কোল। বড় রাস্তার সব চেনা। দু-পাশে মাটির ঘর বাড়ি, মাঠের গরু, ছাগল, মুরগি, শুয়োর, কখনো বড়ো পুকুর, কখনো ছোটো পুকুর, কখনো বট গাছ— দূরের উঁচু জমি, নিচু জমি, শালিক চড়ুই, চিল কি ঘুঘু, গম বা ধান— সব চেনা, বড়ো রাস্তা বড়ো চেনা। সারি সারি বাড়ি, সারি সারি গাছ, চারদিকে ছড়ানো ছোটো ছোটো মানুষ, এই এতটুকু এতটুকু। তাদের আবার ন্যাংটো শিশু, বড়ো বড়ো কালো পোকায় সাইজের মেয়েমানুষ, ঝুলন্ত পড়ন্ত বুড়ো মানুষ, উঁচু জমিতে আদুরে তালগাছ, পগারে শুয়ে-থাকা চকচকে পালিশ করা পাতাভরা জাম গাছ। গাড়ির ভিতর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাতাসটা খুব চেনা, উড়ন্ত ধুলো কাঁকরের মেশাল

দেওয়া বাতাস গাড়ির কাচের জানালায় কখনও কখনও পায়রার ঝাঁকের মতো এসে পড়ছে তারপর ভীষণ চেনা জাতপাতহীন থানা, শহর, পৃথিবীর ভূমিতে পুঁজরক্তভরা আধশুকনো ঘায়ের মতো। মলমহীন, সান্ত্বনাহীন।

এইবার মাঝারি রাস্তা। দূরবীনকে একবারও সামনে দেখা গেল না, জানি না কী ওর মতলব। থানাশহর শেষ হয়ে গেছে, শহরপ্রান্তের গলিত বিকলাঙ্গ বাড়িঘরগুলি থেকে চুরচুর শব্দে পচা চুয়ানি এক বিরাট বদ্ধ জলায় এসে জমছে। সেখানে বড়ো রাস্তা ছেড়ে মাঝারি রাস্তায় ঢুকতে যাব, রাস্তার সেই মুখটায় বিরাট এক জোড়া নিম গাছ কোমরে কাপড়-বাঁধা পাইকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তক্ষুনি তীব্র আওয়াজ করে দূরবীন তার সঙ্গীকে নিয়ে হোন্ডা হাঁকিয়ে চলে গেল। সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। কিছু বোঝার আগেই সে লাল-কালো একটা বিন্দু হয়ে গেল। তার হোন্ডার রং টকটকে লাল।

পথটা বোঝা গেল। পাজেরো জোড়া নিমগাছ দুটো পেরিয়েই একবার আগাগোড়া কেঁপে উঠল, দু-তিনবার টাল খেল, রাস্তার পাশে গড়িয়ে পড়ার ভাব করল, তারপর ঠিকঠাক আবার রাস্তার মাঝখানে এসে অসাড়ে গড়িয়ে চলল। পাঁচজনে নিঃশ্বাস নিতে নিতে গাড়ির ভিতরের বাতাসটা ভীষণ ভারি করে ফেলেছি। একটু নেশার মতো লাগছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। পাজেরোকে থামিয়ে দরজা জানালা খুলে ভিতরের অক্সিজেন ফুরিয়ে-দেওয়া বাতাসটা বের করে দিয়ে নতুন বাতাস ঢুকিয়ে নেওয়া যায় কিনা ভাবছি, নিজেদের ভিতরের সম্পর্কগুলি কেমন গোলমেলে হয়ে উঠল— বিয়ারের ফল কি, সবাই তো বিয়ার খায়নি— পাশের মানুষটির নাম যেন কী, আমাকে সে কি বলে যেন ডাকে? টিকিসুদ্ধ সে ডুবিয়ে দিয়েছে বদ্ধ নিথর কালো জলে টইটম্বুর একটা ডোবার মধ্যে, দু-একটা বুড়বুড়ি কাটছে দম আটকানো জলে নিঃশ্বাস ছাড়ছে বলে। কোথায় যেন ধস নেমে গেল, দু-তিনটি থাম মুখ থুবড়ে পড়ল গুঁড়ি-কাটা গাছের মতো আর ততক্ষণেই বাইরেটা প্রায় অপরিচিত হয়ে উঠল। মাটিটা চেনা যায় না, গাছগুলো বেঁটে আর মোটা, চেনা গাছের মতো লাগে না, ঘাসগুলোয় ধারালো ফলা আছে। হঠাৎ দেখা গেল দূরবীনকে, খুব জোরে হোন্ডা হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দূরে সে আছে, ছোটো একটা বিন্দু, হঠাৎ ভীমরুলের মতো আওয়াজে সে পাজেরোর এত কাছে এসে পড়ে যে স্পিড কমিয়ে আনতে হয় যাতে চাপা না পড়ে। খুব কাছে, সমস্ত মাথা জোড়া ভীমরুলের চোখের মতো দূরবীনের চকচকে কালো কাচের দুটি বিরাট গোল

amarboi.com

চোখ দেখা যায়। মাথার সবদিকেই চোখ, বনবন করে ঘোরাচ্ছিল, একবার তা-ও দেখা গেল। কেমন দেখছিল চারপাশটা দূরবীন? সে কি কাছের জিনিশ দেখছিল, না অনেক দূরের জিনিশ? আবার সামনে থেকে হারিয়ে গেল দূরবীন। পাজেরোর কাচে ঠক করে মাথা ঠুকে একটুর জন্য মূর্ছা গেল ভীমরুলটা।

রেললাইন, রেলগেট, লালটিনের স্টেশন, লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বোবা ট্রেন, থাকে থাকে সাজানো ধানের মাঠ, দু-একটি পদ্মপুকুর, মাটির বাড়ি, দু-একটি বট অশথ গাছ, ভাঙা মন্দির, পুরনো মসজিদ এখন পিছনে কোন জগতে ফেলে এসেছে পাজেরো। বেঁটে গাছ, অচেনা মাটি, বেঁটে মহুয়া, বেঁটে পলাশ, তলোয়ারের মতো বড়ো কটা রঙের ফলাওয়ালা ঘাসও পিছনে পড়ে মাঝারি রাস্তা শেষ হয়ে এল। পাজেরো এখন কী করবে। সে দাঁড়িয়ে গেল। দরজা খুলে নামতেই সামনে দূরবীন। সে ধপধবে শাদা দাঁত বের করে হাসছে। তার হোন্ডার দেখা নেই। নাকে তার চশমাও নেই। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে দূরবীন!

চোখদুটি ছোট করে নিয়ে ভুরুর নিচে বসিয়ে দূরবীন বলল, সঙ্গেই তো ছিলাম ছার। আমাকে দেখতে পাননি কেনে?

কোথায় সঙ্গে ছিলে তুমি? মাত্র একবার তুমি ঘুরে এসেছিলে।

বাঁকা করে বসানো কোদালের মতো দেখতে শাদা দুটি দাঁত বের করে কড়কড় শব্দে দূরবীন বলল, লোকে ভুলে না দেখা জিনিশ দ্যাখে আর আপনি দেখতে পাওয়ার জিনিশ ভুল করে দেখতে পেলেন না? আজব কথা কহিছেন কেনে। আমি তো সব সোমায় গাড়ির সামনেই আছি।

তোমার সঙ্গের ছেলেটি কই?

যোহান? নামায়ে দিছি, ওকে আর দরকার হবেক লাই। আমাকে জন্মের পরেই খট্টা মাটিতে ফেলে সুয্যুর আগুনে পোড়ানো হইছিল তো।

তার মানে?

সুয্যুর আলোর মধ্যে থাকলে আমাকে অনেক সোমায় দেখতে পাওয়া যায় না।

এতক্ষণে চমকে চেয়ে দেখি চামড়া-ছেলা শাদা মাঠ আর বলির রক্তলাগা খাঁড়ার মতো রোদ ছাড়া আর কিছু নেই কোনোদিকে। অবশ্য মাটির হাড়ের তৈরি সরু একটা রাস্তা পড়ে আছে।

গাড়ি আর যাবেক লাই। উই দেখা যেছে অম্রিতডাঙা।

একদিকে হাত তুলে সে দেখায়। রোদ আর মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

সাঁওতাল গাঁয়ে কুকুর নেই? লাল আর কালো বেঁটে গোল গোল কুকুর আজকাল তোমাদের গাঁয়ে থাকে না?

কুকুর ছাড়া মানুষ আছে ছার? তেবে বড়ো হবার আগেই কুকুরগুলো মরে যেছে ছার। ইদিকে কুকুরের একটো কাজও করতে পারে না এমন কুকুর হয়ে যেছে মানুষগুলি। এমনসব নেড়ি কুকুর সাঁওতালরা লিবে না। আপনি কি কুকুর দেখতে পেছেন?

দূরবীন, গরম বাতাস কাঁপতে কাঁপতে কুকুর হয়ে যাচ্ছে যেন, কুকুর নয়, কুকুরদের লাল চোখ। কুকুরের হাজার হাজার লাল চোখ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাছেন? দেখতে পাছেন? তীব্র উত্তেজনায় দূরবীন চিৎকার করে উঠল, আপনার বন্ধুরা কেউ দেখতে পাবে নাই, পাবে নাই। শুদু আপনি পাবেন। চলেন ছার, এখানে গাড়ি রেখে, ডেরাইভারকে রেখে আমরা এই রাস্তা ধরে যাই।

দূরবীনের সঙ্গে যত কথা এতক্ষণ ধরে বলেছি আর এই যে, এখন বলছি, বন্ধুদের মধ্যে কেউ তা শুনেছে বলে মনে হয় না, কারণ তার সঙ্গে এত কথাতে কেউ একটি কথাও বলেনি। শাদা মাটির হাড়ে তৈরি রাস্তায় নামার জন্যে তাদের কোনো কথা বলতে হলো না, ছুরির তলায় গলা পেতে দেবার মতো একে একে তারা রাস্তায় নামে। দূরবীন তার ময়লা প্যান্টের পকেট থেকে নিমডালের ডাঁটিতে লালসুতো লাগানো চশমাজোড়া বের করে চোখে পরে নিল আর দু-তিনবার আড়িমুড়ি ছেড়ে ইঞ্চিতিনেক মাথায় উঁচু হলো।

দূরবীন, বাতাসে এত চোখ ভেসে বেড়াচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় এক একটা মাথায় বসে তোমাদের লাল রঙের কুকুর হয়ে যাবে না তো?

এবার হি হি করে হেসে উঠল দূরবীন, উসব কুকুরের চোখ লয় ছার, উসব অক্তঝরা লাল চোখ বাতাসের চোখ, রোদের চোখ, জমির আর আকাশের চোখ। খুব তেষ্টা, অনেক জল চাহেছে, জল পেলে নিভে যায়। অনেক দেখেছি, জল দিয়ে তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেই নিভে যায়। কালো কালো কাঠকয়লা পড়ে থাকে। এই রাস্তা পার হলে বিল, অনেক জল। ঠিক জলের মতো। শাদা চাদরের মতো সমান মাঠের ওপর পাতা–

একেবারে সমান ছার, কুথাও কুনো ঢেউ নাই, বাতাসও নাই। তার পুবপাড়ে অম্রিতডাঙা।

বিলে মাছ নেই দূরবীন?

বিলে কুনো মাছ নাই, শামুক গুগলি ঝিনুক নাই, কুথাও ঘাস নাই, বিলের মাঠে ঘাস নাই, বিলের পাড়ে ঘাস নাই, জলে ঘাস নাই, শ্যাওলা নাই। বিলের তলার মাটি চুনের মতো শাদা ছার। সাঁওতাল ওঁরাও-রা কুনোদিন মাছ ধরে না ছার, সাঁওতালরা মাংস পছন্দ করে।

তবে যে সিলভার কার্প মাছের ভোজ হচ্ছে!

সাঁওতালদের এখুন আর কুচ্ছু মনে নাই, সাঁওতাল আর ওঁরাও শালারা মরে গেঁইছে। ওরা আর জম্মায় না ছার। ওদের বউরা আর বিয়োয় না, ওরা আর ওদের বউদের সাথে শোয় না, শুলেও আর বাচ্চা হয় না, বাচ্চা হলেও মরে যায়, বাচ্চা যদি বা বাঁচে ছার বাচ্চার মায়ের জম্মদ্বার দিয়ে সুতোর মতুন রক্তপড়া আর বন্ধ হয় না। তা বাদে ধরে ল্যান, মুরগিগুলিন ডিম পাড়ে না, কবুতরের বাচ্চা হয় না, হাঁসের বাচ্চাগুলিন পুকুরে চরতে গিয়ে জলের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে মরে থাকে, গরুভেড়া শুয়রগুলিনও তাই, গাভীন হয় না।

তবু তুমি তো বেশ তাগড়া জোয়ান রয়েছ দূরবীন!

হেঁ হেঁ আমি, আমি ছার– বলতে বলতে দূরবীন আর নেই। যখন আবার তাকে দেখতে পাই, সে আমাকে ধরে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে আছে।

এক ঘণ্টা পর সবকিছু এতই একরকম আর শুরুর মতোই এতই অপরিচিত যে ঘড়ি কোনো কাজ করল না, ঘড়ি দেখে কিছুই বোঝা গেল না, দূরবীন বলল, দেহেন, সামনে বিল। উই যি বিলের পুবপাড় ঘেঁষে অম্রিতডাঙা আর উই যি একটুকু দূরে আমাদের ওঁরাওদের গেরাম।

ছোটো রাস্তাটিও শেষ। একেবারে ডবল দাঁড়ি দেওয়া। এইখানে পৃথিবীর কিনারা, সময়ও শেষ, জায়গাও শেষ। পা ফেলতেই কিনারার বাইরে, সময়ের বাইরে। কিনারা পেরিয়ে ভুক্তাবশিষ্ট এটোকাঁটা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। বিলটা পারদ-শাদা, নিভাঁজ ধাতব চাদরের মতো পাতা, কোনো প্রতিফলন নেই, শুধু দিনের তীব্র আলো ছিটকে ফেলে দেয়। সেদিক থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চোখ সরিয়ে আনতে পারলেই ভালো। রাতে অন্তত বিলের পুবপাড়ের চওড়া বাদামি মাটির উপর পাতা অমৃতডাঙি গাঁ-টিকে দেখতে পাওয়া যায়। শদুয়েক গজ চওড়া, মাইলটাক লম্বা এক চিলতে উঁচু-নীচু জমিতে সাঁওতালদের একটির পর একটি পোড়ো-পোড়ো বাড়ি। সাঁওতালরা

কিছুতেই পুরো পড়তে দেবে না, তারা তালি মারবে, ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া আঁকাবাঁকা সেলাই করবে, গাছের হাড়, মানুষের হাড় গুঁজে দিয়ে চালাগুলিকে খাড়া করে রাখবে। ন্যাকড়াফালি, শুকনো পাতা, মাটি দিয়ে ফুটো বুজিয়ে দেবে আর যদি কোনোমতে একখানিও আস্ত মাটির বাড়ি থাকে, তা হলে সাঁওতালবউ সিঁদুর-মাটি লেপে, নীল-মাটি লেপে, আলকাতরা-মাখানো দরজায় শিকল দিয়ে সেখানে জীবনের ছায়া আর শান্তি আটকে রাখবে। সেই অমৃতডাঙির পশ্চিমে শিয়রে তির-সোজা সরলরেখায় বিল আর পৃথিবীর কিনারা, পুবে তেমনিই সরলরেখায় ভীষণ সবুজ ধানের মাঠ। অমৃতডাঙিতে একটিও ভিটে নেই, মাটি আর ঘরের মেঝে একই সমতলে। এখানে সেখানে উঁচু মাটির ডিবিগুলিতে গোখরো আর উইপোকা আর গাঁয়ে ঢোকার মুখে একটিমাত্র নিখুঁত অক্ষয় বিশাল বট যাতে ওরা যে এখনো কেন বেঁচে আছে, তার কারণ বোঝা যায়।

ভোজের রান্না হচ্ছে বটতলায়। দূরবীন, আমরা যাব কোন্ পথে? কোথায় নিয়ে যাবে পথ দেখাও।

পথ কুছু নাই ছার, যিখানে পা দিবেন সিখানেই পথ।

শোনো দূরবীন, একবারে আমাদের সামনে থাকবে, কোথাও যাবে না বলে দিচ্ছি আর কোনো গল্প নয়। ওদের রান্না হবে কখন, দুপুর তো গড়িয়ে গেল, লোকজন খাবে কখন?

সি দেরেং আছে ছার। রান্না হবে কী করে? কাঠ লাকড়ি কুছু নাই। সাঁওতালদের কুনো গাছ নাই, গাঁয়ে গাছ যা দেখেন তার একটাও সাঁওতালদের নয়। চুলোর মধ্যে কাঠি-খোঁচা যা দিবে তাতে হবে না, নিজের ঠ্যাং ঢুকায়ে দিবে, তেবু আগুন নাই, খালি ধোঁয়া। মালিক বলবে তুদের গরুর গবর পোড়াবি না, এট্টু পচিয়ে জমিতে দিবি, দুটো পয়সা পাবি। বাড়িতে হাগবি না, জমিতে এসে ছেলে-বউ লিয়ে হাগবি– ফিরি পাইখানা!

বুঝে যাই দূরবীনকে ঠেকানোর উপায় নেই। গল্প ছাড়া মানুষ নেই, সব মানুষের গল্প আছে, গল্প সে বলবেই।

দেরেং তো আছে দূরবীন– তা বলে দুপুরের খাওয়া কি রাতে খাবে?

তাতে ক্ষেতি কী ছার! সকাল দুপুর রাত কী– খাতে যে পাছে তাই তো অ্যানেক হয়ে যেছে।

ওদিক থেকে সরু ধনুকের মতো বাঁকা ঠ্যাং ফেলে কোমরে ময়লা ত্যানা জড়ানো খালি-গা যে লোকটি আসছিল, শেষ পর্যন্ত সে পৌঁছুল আমাদের

amarboi.com

কাছে। তার গায়ের চামড়া তেলে চিকচিক করছে, হাড়-কাঠামো ঢাকতে চামড়ায় টান পড়েছে, আর ক'ইঞ্চি বড়ো হলে পুরো তাঁবুটা ঢাকা পড়ত। তার দিকে না তাকিয়েই দূরবীন সাদরি ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল তাকে। সে দু-হাত তুলে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে মাটির দিকে চেয়ে, একবারও না দাঁড়িয়ে কিছু একটা জবাব দিতে দিতে পাশ কাটিয়ে গেল। দূরবীন জানাল লোকটা ভিনগাঁয়ের কনেপক্ষের, বিয়ের পর বর-কনের সঙ্গে এসেছে গতকাল, আবার আগামীকাল মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে নিজের গাঁয়ে ফিরবে। সকাল থেকে এখনো কিছু সে খেতে পায়নি।

কত লোক এসেছে কনের গাঁ থেকে?

কনের গাঁয়ের সব লোক ছার। কাল রাতে হাঁড়িয়া আর আধখানা পোড়া রুটি পেয়েছিল লোকটা। তবে ও শুধু একা পায়নি ছার, ওদের গাঁয়ের পেত্যেকে পেয়েছিল হাঁড়িয়া আর আধখানা রুটি।

যত ইচ্ছা হাঁড়িয়া?

হাঁড়িয়া দিতে হবে! যত ইচ্ছা হাঁড়িয়া। শালা হাঁড়িয়া দিবেক না কেনে? হাঁড়িয়া দিবেক না তো মেয়ের বিহা দিলি ক্যানে, পোলার বিহা দিলি কেনে? দূরবীন খুব মাথা নাড়তে লাগল।

ভাত পচিয়ে হাঁড়িয়া? তবে যে খানিক আগে বললি পচুই পাবে কুথাকে?

বলিছি তো কী হলছে? হাঁড়িয়া দিতে হবেক। হাঁড়িয়া না থাকলেও হাঁড়িয়া দিতে হবেক, হ্যাঁ!

চেয়ে দেখি দূরবীন মাথা দোলাচ্ছে চক্কর তোলা রাজগোখরোর মতো। মাথা একবার সামনে, একবার পিছনে, হঠাৎ-আসা নীরব বাতাসের হিল্লোলের মতো, কোথাও কোনও ঘোঁচ নেই, রমণের জন্য ঝুঁকে-পড়া রাজহাঁসের মতো। তখন মাদলের একঘেয়ে বিষণ্ণ শব্দ পাই। বিয়ে-বাড়ির বাইরে বুড়ো হতচ্ছাড়া একটা শিউলি-গাছের তলায় সারা গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ জড়ো হয়েছে। চার-পাঁচটা মাদল, দু-তিনটি খঞ্জনি আরো সব যন্ত্র কিছুতেই একসাথে বাজতে চাইছে না! একদল মেয়ের ভীষণ উপোসি দখলি নাচ সবকটি বাজনাকে জব্দ করে একটা মন্তরপড়া তালের মধ্যে এনে ফেলেছে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, নাচের বৃত্তের গায়ের উপর এসে গিয়েছি, তবু কি খেয়াল করল কেউ? দুই প্রৌঢ়, এক বুড়ো আর যুবক বাজাচ্ছে মাদল। বুড়োটাই বাজাচ্ছে ভালো। কিন্তু তার মাদলটা ভালো নয়। বাঁহাতের আঙুলের কাজ যে দিকটায় সেদিকের চামড়া ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে যেমন ঝুলেছে তার পুরুষালি বোঁটাসুদ্ধ

শুকনো আমসি বুক জোড়া। কমবয়সি ছোঁড়াটার বাজনা সবচেয়ে খারাপ। হাঁড়িয়ার নেশায় কিনা কে জানে! সে ঝোঁকের মাথায় ঢিপঢাপ পিটিয়ে যাচ্ছে মাদল। তারা কেউ চোখ চেয়ে নেই। সবাই কেমন আমেজে ঘুমিয়ে আছে। দূরবীন হেঁকে উঠল, ভোজের এখনও দেরেং আছে হে, বাবুরা এসেছে বিহা দেখতে। তা দেখাও কেনে? ভালো করে লাচ্ রে মেয়েগুলান। বাবুদের বসতে দাও না কেনে হে, চেয়ার আর মোড়া আনো না কেনে। বাবুরা দাওয়ায় বসে লাচ দেখুক।

চাল এত নীচু যে মাথা হেঁট করে গুঁড়ি মেরে দাওয়ায় উঠতে হয়। কাঠের চেয়ার, ভাঙা তেপায়া, মোড়া, লোহার চেয়ার যার অনেকটা জং ধরে খসে গেছে আর একটা উঁচু পিঁড়ি। ঘাড় নিচু করে লোকজন দেখছি। নাচ দেখছি, চোদ্দ-পনেরো বছরের এক ছোঁড়া কঞ্চি কাঠি দিয়ে তৈরি মোটা রশির একটা লেজ লাগিয়ে, কালি ঝুলি মেখে হনুমান নাচছে। আর মাদলের তালে তালে, দুটি বুড়ি, তিনটি প্রৌঢ়া, দুটি কিশোরী আর কটি যুবতি মিলে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে সামান্য নীচু হয়ে এক পা এগিয়ে পিছিয়ে দুলে দুলে তাদের সেই হাজার হাজার বছরের পুরনো নাচ নাচছে, নতুন কথা দিয়ে হাজার হাজার বছরের পুরনো সুরে গান গাইছে, যেমন করে বর্ষাকালে শালবনে ময়ূর নাচে ময়ূরীর সামনে, রাজগোখরো ঘাড় তুলে এগিয়ে যায় গোখুরানির কাছে, ছোটনাগপুরের পাহাড় সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকারের মধ্যে যেমন আফিমখোরের মতো ঝিমুতে থাকে, তেমনি করেই গাইছে আর নাচছে মেয়েরা— ওদের পিছনে আদিগন্ত সবুজ মাঠ! যুবতিদের শক্ত হাত, শক্ত চুল, শক্ত বুক। তাদের খালি পোক্ত ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ধুলো-মাখানো পা, কোদাল-কোপানো শক্ত কোমর এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে। সরষের তেল-চুয়ানো সিঁথিতে গলে-পড়া সিঁদুর আর তাদের কালো নির্বিকার ভোঁতা হতাশমুখে দুপুরের সূর্য— আমরা কি বসে বসেই ঢুলতে শুরু করি! এই ভয়ানক উৎসব বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে। কে বলে রবিবার শেষ হবে? কোনওদিন কি শেষ হবে?

আমাদের পায়ের কাছে মেঝের উপর তিন কিশোরী। তাদের কাঁধে পুরনো কাচা গামছা। হাতে সরষের তেলের ভাঁড়। সামনে বড় এনামেলের গামলায় টলটলে জল।

কোনাকুনি বসানো দুটি কোদালে-দাঁত বের করে, দূরবীন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে টিক টিক করে উঠল, ওরা পা ধুইয়ে দিতে এসেছে ছার। সরষের

তেল মাখিয়ে, তারপরে পা ধুইয়ে মুছিয়ে দেবে। আমাদের লিয়ম। অতিথকে বরণ কর্যা হয়।

পা দুটি শিরশির করে, এত অসহায় লাগে, এত অসহায় লাগে! নেড়ি কুকুরের মতো বেঁধে মারবে, মাথায় ঘাড়ে পিঠে ঠ্যাঙা দিয়ে পিটোবে! নেড়ি কুকুরের মতোই কেঁউ কেঁউ গলার আওয়াজ বের করি। তাতেও বাতাস পাই না। দূরবীন, কিছুতেই কথা শুনবি না তুই? গল্প করতে বারণ করলাম না! তবু, তবুও 'আমাদের লিয়ম' বলে দিলি! এই কাজটা করিস না, করিস না দূরবীন। ওদের করতে দিস না। দূরবীন আকাশের দিকে চেয়ে বলল, মাশাই ছার, ই যি লিয়মের বার হয়্যা যাবে। সাঁওতালদের রপমান হবে যি! পা ধুঁয়ে দেওয়াই হোবে।

দূরবীন থামো– জুতোর ফিতে খুলি, জুতো খুলি, মোজা খুলি।

সি ওরাই করে দিবেক। এ বিটিছোয়াগুলোন শুরু কর না কেনে?

একটা শ্যামলা সরু লতানো হাত পায়ের দিকে এগিয়ে আসে, তারপর ওই রকম আর একটি। জুতোর ফিতে খুলে ফেলে, টান দিয়ে জুতো খোলে, মোজা খোলে, কোলের কাছে টেনে নেয় পা, একটু সরষের তেল লাগিয়ে দেয়, গামলার জলে পা ডুবিয়ে দেয়, আর একটু তেল মাখায়, আবার ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে কলবল সামান্য শব্দ করে ধোয়, তারপর গামছা দিয়ে মুছে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করে। আরণ্যক সোঁদাগন্ধ আসে। ঝিমুনো আধা-ঘুমভরা সুরে গান আর মাদলের শব্দ আসে।

এইবার যি একবার উই ঘরে যাতে হবে ছার। অতিথ সেবা হবেক। দূরবীন কপাটহীন একটা গোয়ালঘরের দিকে যায়। মাটির ঠান্ডা উঁচু-নিচু মেঝে। গরুর গন্ধ আছে, গরু নেই। মেঝেতে খেজুরপাতার পাটি পাতা, তার উপর ছোটো ছোটো গ্লাস আর একটা মাটির কলসি।

এইখানে বসেন ছার, দু-একজন মুরুব্বি আসুক, তারা দেখবে অতিথ সৎকার হচ্ছে।

একটু পরেই কলসির ভিতর ছলাৎ ছলাৎ– তার ভিতর কুলকুল করছে কত ফুর্তি, কত মজা, কত বসন্ত-রাতের রমণসুখ, কত স্মৃতি, কত বিস্মৃতি, রাতপাখির ডাক, কখনো কুচকুচে কেউটের নিঃশব্দ বুকে হাঁটা আর কখনও কলসি সামান্য নড়ে, দারুণ ব্যথায় ককিয়ে কেঁদে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাওয়া সরে যাচ্ছে খোলা মাঠের দিকে। আমি এক গ্লাস খাই, দুই গ্লাস খাই, আর

খাব না, তিন গ্লাস খাই, আর কিছুতেই খাব না, বন্ধুদের চোখ চকচক করে, তাদের কেউ একটিও কথা বলে না।

কলসটাকে আবার ভরে আনো হে, বাবুরা আরো খাবে, বাবুদের ভালো লেগে গেঁইছে–

হাঁ, ভরে আনো হে, আবার ভরে আনো, আমাদের পচুইয়ের অভাব লাই, খেঁতে পাই না, হিঁ, তেবু পচুইয়ের অভাব লাই, পচুইয়ের অভাব হঁতে লাই, অকল্যাণ হবেক, অকল্যাণ হবেক–

চোখমুখ কুঁচকে ঢেকুর তুলতে তুলতে এক বুড়ো বলে, বউগুলান বাঁজা হচে তো হোক, বিটিছোয়াগুলোর গভভো হছে না, না হোক, পচুইয়ের অভাব আমাদের হবেক লাই।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা টলমল করে ওঠে। দূরবীন নির্দেশ জারি করে, ইবার বাড়ির ভিতরে বয়-কনেকে আশীর্বাদ। তুমরাও চলো হে।

একে অন্যের কোমর জড়িয়ে অনেক ঝুঁকে পড়েছে মেয়েরা। বুড়ো মাদলওয়ালা মূর্ছাগ্রস্তের মতো খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে উঠছে। এইবার সে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওরা এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী গান গাইছে, অনেক ধীর লয়ে, আর ঝুঁকে পড়বে পড়বে আর উঠে দাঁড়াবে। পাথর-কোঁদা চেহারার একটিমাত্র মেয়ে ঘাড় উঁচু করে পুব আকাশের দিকে চেয়ে দুলছে ঢেউ-ওঠা নদীতে নৌকোর মতো, তার সক্ষম উরু দুটি, প্রশস্ত ভারী নিতম্ব যারা নাচ দেখছে তাদের চোখে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে।

দূরবীন, কী গান এটা? কী বলে এই গানে?

হেই মেয়েগুলান, গানটো বাংলায় গাও না কেনে?

দোষ কর্যাছি বড়ো ভাই, অপরাধ কর্যাছি বড়ো ভাই– মেয়েরা প্রায় ঘুমুতে ঘুমুতে একই সুরে গেয়ে উঠল, দোষ কর্যাছি বড়ো ভাই, অপরাধ কর্যাছি বড়ো ভাই–

বড়ো ভাইয়ের কাছে কী অপরাধ করেছে, তোমার কাছে পরে শুনব দূরবীন। ওদের আর একটা গান গাইতে বলো না!

হেই মেয়েগুলান, হেই বিটিছেল্যাগুলা তুমাদের আর কুনো গান নাই?

সঙ্গে সঙ্গে সামান্য সুর পালটে একই মিইয়ে আসা তালে নতুন গান কানে এল : বাবা কিন্যা দিলে হারমোনিয়াম, বাপে বানিয়ে দিলে বাঁশি, সকালে কাজে যাব, কখুন তবে বাজাব।

amarboi.com

পুবের সবুজ মাঠের দিকে চেয়ে হঠাৎ আমি বলি, দূরবীন, তোমরা কী খাও আর কেমন করে বাঁচো, আমাদের শিখিয়ে দেবে?

দূরবীন কানের কাছে বোমা ফাটিয়ে দেয়। ওর বোমা কি আত্মঘাতী, ওকেও কি ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে ছিটিয়ে দেবে, শিখতে লারবেন ছার, শিখতে লারবেন? আমরা সোমবছর কি খাই তা জিগাছেন? আমরা শাকপাতা ছিঁড়্যা খাই, ঘাস কালাই সেদ্ধ করে খাই, খামচে খামচে মাটি তুলে খাই, খিদেয় প্যাটে মাটি লেপি, ইঁদুর-ছুঁচো মেরে খাই, শামুক গুগলি খাই। আমাদের খাবারের কুন্নো অভাব নাই।

দূরবীনের দিকে তাকানো কঠিন। সে দাউদাউ করে জ্বলছে। তার শরীরের কোথাও ফেটে গেছে বোমাটা, আগুন এগিয়ে আসছে। সে তেরছা দাঁত-দুটো মেলে ভেংচি কেটে বলছে, এই মাঠে এক ধান ছার, আমরা এই জমি চাষ করি, মাট্টিকে ভালোবেসে তাতে ধানের খামার করি, চারাগাছে আলো আর বাতাস দিই, এইখান থেকে হুই অ্যানেক দূরে মাঠের ওপার পর্যন্ত আমরা গড়াগড়ি দিই, ধান কাটি, মাড়াই করি, ধানে ধানে গা ঘষি, ছেলেপিল্যাকে ধানে ফেলি, তারপর এই ধান মালিকদের কাছে যায়। আর কুনো ধান আমরা দেখি না। আমাদের দিষ্টি নাই।

আগুন নিভে আসছিল দূরবীনের। সে কেমন জুড়িয়ে যেতে যেতে বলল, সাঁওতাল-ওঁরাও-রা না খেঁয়ে খেঁয়ে শিখেছে ক্যামন করে খেয়ে-পরে বাঁচতে হয়।

—